আল কাহ্ফ

১৮

নামকরণ

প্রথম রুকূ'র ৯ আয়াত اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ নাম দেবার মানে হচ্ছে এই যে, এটা এমন একটা সূরা যার মধ্যে আল কাহ্ফ শব্দ এসেছে।

নাযিলের সময়-কাল

এখান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলো শুরু হচ্ছে। মক্কী জীবনকে আমি চারটি বড় বড় অধ্যায়ে ভাগ করেছি। সূরা আন'আমের ভূমিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। এ বিভাগ অনুযায়ী তৃতীয় অধ্যায়টি প্রায় ৫ নববী সন থেকে শুরু হয়ে ১০ নববী সন পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর মোকাবিলায় এ অধ্যায়টির বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী অধ্যায় দু'টিতে কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এবং তাঁর আন্দোলন ও জামায়াতকে বিপর্যস্ত করার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপহাস, ব্যাংগ-বিদ্রূপ, আপত্তি, অপবাদ, দোষারোপ, ভীতি প্রদর্শন, লোভ দেখানো ও বিরুদ্ধ প্রচারণার ওপর নির্ভর করছিল। কিন্তু এ তৃতীয় অধ্যায়ে এসে তারা জুলুম, নিপীড়ন, মারধর ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির অস্ত্র খুব কড়াকড়িভাবে ব্যবহার করে। এমনকি বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে দেশ ত্যাগ করে হাবশার দিকে যেতে হয়। আর বাদবাকি মুসলমানদের এবং তাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও বংশের লোকদের আবু তালেব গিরি গুহায় পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। তবুও এ যুগে আবু তালেব ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) ন্যায় দু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে কুরাইশদের দু'টি বড় বড় শাখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। ১০ নববী সনে এ দু'জনের মৃত্যুর সাথে সাথেই এ অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটে। এরপর শুরু হয় চতুর্থ অধ্যায়। এ শেষ অধ্যায়ে মুসলমানদের মক্কায় জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মুসলমানদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করতে হয়।

সূরা কাহ্ফের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, মক্কী যুগের এ তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় জুলুম, নিপীড়ন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তখনো মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেনি। তখন যেসব মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছিল তাদেরকে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী শুনানো হয়, যাতে তাদের হিম্মত বেড়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, ঈমানদাররা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য ইতিপূর্বে কি করেছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কার মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরীক্ষা নেবার জন্য আহ্‌লি কিতাবদের পরামর্শক্রমে তাঁর সামনে যে তিনটি প্রশ্ন করেছিল তার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। প্রশ্ন তিনটি ছিল : এক, আসহাবে কাহ্‌ফ কারা ছিলেন? দুই, খিযিরের ঘটনাটি এবং তার তাৎপর্য কি?[১] তিন, যুলকারনাইনের ঘটনাটি কি? এ তিনটি কাহিনীই খৃষ্টান ও ইহুদীদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত ছিল। হিজাযে এর কোন চর্চা ছিল না। তাই আহ্‌লি কিতাবরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যিই কোন গায়েবী ইল্‌মের মাধ্যম আছে কিনা তা জানার জন্যই এগুলো নির্বাচন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে কেবল এগুলোর পূর্ণ জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ ঘটনা তিনটিকে সে সময় মক্কায় কুফর ও ইসলামের মধ্যে যে অবস্থা বিরাজ করছিল তার সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে দিয়েছেন।

এক : আসহাবে কাহ্‌ফ সম্পর্কে বলেন, এ কুরআন যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছে তারা ছিলেন তারই প্রবক্তা। তাদের অবস্থা মক্কার এ মুষ্টিমেয় মজলুম মুসলমানদের অবস্থা থেকে এবং তাদের জাতির মনোভাব ও ভূমিকা মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের ভূমিকা থেকে ভিন্নতর ছিল না। তারপর এ কাহিনী থেকে ঈমানদারদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি কাফেররা সীমাহীন ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী হয়ে গিয়ে থাকে এবং তাদের জুলুম-নির্যাতনের ফলে সমাজে একজন মুমিন শ্বাসগ্রহণ করারও অধিকার হারিয়ে বসে তবুও তার বাতিলের সামনে মাথা নত না করা উচিত বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত। এ প্রসংগে আনুসংগিকভাবে মক্কার কাফেরদেরকে একথাও বলা হয়েছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী আখেরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার একটি প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্‌ফকে সুদীর্ঘকাল মৃত্যু নিদ্রায় বিভোর করে রাখার পর আবার জীবিত করে তোলেন ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন মেনে নিতে তোমরা অস্বীকার করলে কি হবে, তা আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে নয়।

দুই : মক্কার সরদার ও সচ্ছল পরিবারের লোকেরা নিজেদের জনপদের ক্ষুদ্র নও মুসলিম জামায়াতের ওপর যে জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছিল এবং তাদের সাথে যে ঘৃণা ও লাঞ্ছনাপূর্ণ আচরণ করছিল আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনীর পথ ধরে সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এ প্রসংগে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এ জালেমদের সাথে কোন আপোস করবে না এবং নিজের গরীব সাথীদের মোকাবিলায় এ বড় লোকদেরকে মোটেই গুরুত্ব দেবে না। অন্যদিকে এ ধনী ও সরদারদেরকে এ মর্মে নসীহত করা হয়েছে যে, নিজেদের দু'দিনের আয়েশী জীবনের চাকচিক্য দেখে ফুলে যেয়ো না বরং চিরন্তন ও চিরস্থায়ী কল্যাণের সন্ধান করো।

১. হাদীসে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল রূহ সম্পর্কে। বনী ইসরাঈলের ১০ রুকূ'তে এর জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা কাহ্‌ফ ও বনী ইসরাঈলের নাযিলের সময়কালের মধ্যে রয়েছে কয়েক বছরের ব্যবধান। আর সূরা কাহ্‌ফে দু'টির জায়গায় তিনটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমার মতে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি হযরত খিযির সম্পর্কেই ছিল, রূহ সম্পর্কে নয়। খোদ কুরআনেই এমনি একটি ইশারা আছে, তা থেকে আমার এ অভিমতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যাবে। (দেখুন ৬১ টীকা)।

তিন : এ আলোচনা প্রসংগে খিযির ও মূসার কাহিনীটি এমনভাবে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাতে কাফেরদের প্রশ্নের জবাবও এসে গেছে এ সংগে মুমিনদেরকেও সরবরাহ করা হয়েছে সান্তনার সরঞ্জাম। এ কাহিনীতে মূলত যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যেসব উদ্দেশ্য ও কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে আল্লাহর এ বিশাল সৃষ্টিজগত চলছে তা যেহেতু তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তাই তোমরা কথায় কথায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করো, এমন কেন হলো? এ–কি হয়ে গেলো? এ–তো বড়ই ক্ষতি হলো! অথচ যদি পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে এখানে যাকিছু হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে এবং বাহ্যত যে জিনিসের মধ্যে ক্ষতি দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত তার ফলশ্রুতিতে কোন না কোন কল্যাণই দেখা যায়।

চার ঃ এরপর যুলকারনাইনের কাহিনী বলা হয়। সেখানে প্রশ্নকারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয় যে, তোমরা তো নিজেদের এ সামান্য সরদারীর মোহে অহংকারী হয়ে উঠেছো অথচ যুলকারনাইনকে দেখো। কত বড় শাসক। কত জবরদস্ত বিজেতা। কত বিপুল বিশাল উপায়–উপকরণের মালিক হয়েও নিজের স্বরূপ ও পরিচিতি বিস্মৃত হননি। নিজের স্রষ্টার সামনে সবসময় মাথা হেঁট করে থাকতেন। অন্যদিকে তোমরা নিজেদের এ সামান্য পার্থিব বৈভব ও ক্ষেত–খামারের শ্যামল শোভাকে চিরস্থায়ী মনে করে বসেছো। কিন্তু তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে মজবুত ও সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করেও মনে করতেন সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা যেতে পারে, এ প্রাচীরের ওপর নয়। আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন এ প্রাচীর শত্রুদের পথ রোধ করতে থাকবে এবং যখনই তাঁর ইচ্ছা ভিন্নতর হবে তখনই এ প্রাচীরে ফাটল ও গর্ত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

এভাবে কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলো তাদের ওপরই পুরোপুরি উল্টে দেবার পর বক্তব্যের শেষে আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, বক্তব্য শুরু করার সময় যা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাত হচ্ছে পুরোপুরি সত্য। একে মেনে নেয়া, সে অনুযায়ী নিজেদের সংশোধন করা এবং আল্লাহর সামনে নিজেদের জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করার মধ্যেই তোমাদের নিজেদের মংগল। এভাবে না চললে তোমাদের নিজেদের জীবন ধ্বংস হবে এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ ①
قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ② مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ③ وَيُنذِرَ
الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ④ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ⑤

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোন বক্রতা রাখেননি।[১] একদম সোজা কথা বলার কিতাব, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে সে সাবধান করে দেয় এবং ঈমান এনে যারা সৎকাজ করে তাদেরকে সুখবর দিয়ে দেয় এ মর্মে যে, তাদের জন্য রয়েছে ভাল প্রতিদান। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা বলে, আল্লাহ কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে ভয় দেখায়।[২] এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের বাপ–দাদারও ছিল না।[৩] তাদের মুখ থেকে বেরুনো একথা অত্যন্ত সাংঘাতিক! তারা নিছক মিথ্যাই বলে।

১. অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোন কথাবার্তা নেই যা বুঝতে পারা যায় না। আবার সত্য ও ন্যায়ের সরল রেখা থেকে বিচ্যুত এমন কোন কথাও নেই যা মেনে নিতে কোন সত্যপন্থী লোক ইতস্তত করতে পারে।

২. অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তান–সন্তুতি আছে বলে দাবী করে। এদের মধ্যে রয়েছে খৃষ্টান, ইহুদী ও আরব মুশরিকরা।

৩. অর্থাৎ তাদের এ উক্তি যে, অমুক আল্লাহর পুত্র অথবা অমুককে আল্লাহ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এগুলো তারা এ জন্য বলছে না যে, তাদের আল্লাহর পুত্র হবার বা

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝

হে মুহাম্মাদ! যদি এরা এ শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে দুশ্চিন্তায় তুমি হয়তো এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে।[৪] আসলে পৃথিবীতে এ যা কিছু সাজ সরঞ্জামই আছে এগুলো দিয়ে আমি পৃথিবীর সৌন্দর্য বিধান করেছি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্য থেকে কে ভাল কাজ করে। সবশেষে এসবকে আমি একটি বৃক্ষ–লতাহীন ময়দানে পরিণত করবো।[৫]

আল্লাহর কাউকে পুত্র বানিয়ে নেবার ব্যাপারে তারা কিছু জানে। বরং নিছক নিজেদের ভক্তি শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ির কারণে তারা একটি মনগড়া মত দিয়েছে এবং এভাবে তারা যে কত মারাত্মক গোমরাহীর কথা বলছে এবং বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রভূ আল্লাহর বিরুদ্ধে যে কত বড় বেয়াদবী ও মিথ্যাচার করে যাচ্ছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই।

৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সে সময় যে মানসিক অবস্থার টানাপোড়ন চলছিল এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে যেসব কষ্ট দেয়া হচ্ছিল সে জন্য তাঁর মনে কোন দুঃখ ছিল না। বরং যে দুঃখটি তাঁকে ভিতরে ভিতরে কুরে কুরে খাচ্ছিল সেটি ছিল এই যে, তিনি নিজের জাতিকে নৈতিক অধপতন, ভ্রষ্টাচার ও বিভ্রান্তি থেকে বের করে আনতে চাচ্ছিলেন এবং তারা কোনক্রমেই এ পথে পা বাড়াবার উদ্যোগ নিচ্ছিল না। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এ ভ্রষ্টতার অনিবার্য ফল ধ্বংস ও আল্লাহর আযাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি তাদেরকে এ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য দিনরাত প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর এ মানসিক অবস্থাকে একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ “আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মতো যে আলোর জন্য আগুন জ্বালালো কিন্তু পতংগরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করলো পুড়ে মরার জন্য। সে এদেরকে কোনক্রমে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কিন্তু এ পতংগরা তার কোন প্রচেষ্টাকেই ফলবতী করতে দেয় না। আমার অবস্থাও অনুরূপ। আমি তোমাদের হাত ধরে টান দিচ্ছি কিন্তু তোমরা আগুনে লাফিয়ে পড়ছো।” (বুখারী ও মুসলিম। আরও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সূরা আশ্ শু'আরা ৩ আয়াত দেখুন)

এ আয়াতে বাহ্যত শুধু এতটুকু কথাই বলা হয়েছে যে, সম্ভবত তুমি এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে। কিন্তু এর মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে নবীকে এ মর্মে সান্তনাও দেয়া হয়েছে যে, এদের ঈমান না আনার দায়–দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তায় না, কাজেই তুমি

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝٩ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝١١ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا أَمَدًا ۝١٢

তুমি কি মনে করো গুহা[৬] ও ফলক ওয়ালারা[৭] আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল?[৮] যখন ক'জন যুবক গুহায় আশ্রয় নিলো এবং তারা বললো ঃ "হে আমাদের রব! তোমার বিশেষ রহমতের ধারায় আমাদের প্লাবিত করো এবং আমাদের ব্যাপার ঠিকঠাক করে দাও।" তখন আমি তাদেরকে সেই গুহার মধ্যে থাপড়ে থাপড়ে বছরের পর বছর গভীর নিদ্রায় মগ্ন রেখেছি। তারপর আমি তাদেরকে উঠিয়েছি একথা জানার জন্য যে, তাদের দু'দলের মধ্য থেকে কোন্‌টি তার অবস্থান কালের সঠিক হিসেব রাখতে পারে।

কেন অনর্থক নিজেকে দুঃখে ও শোকে দগ্ধীভূত করছো? তোমার কাজ শুধুমাত্র সুখবর দেয়া ও ভয় দেখানো। লোকদেরকে মুমিন বানানো নয়। কাজেই তুমি নিজের প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাও। যে মেনে নেবে তাকে সুখবর দেবে এবং যে মেনে নেবে না তাকে তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে।

৫. প্রথম আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছিল আর এ দু'টি আয়াতে কাফেরদেকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি সান্তনা বাক্য শুনিয়ে দেবার পর এখন তাঁর অস্বীকারকারীদেরকে সরাসরি সম্বোধন না করেই একথা শুনানো হচ্ছে যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে তোমরা এই যেসব সাজ সরঞ্জাম দেখছো এবং যার মন ভুলানো চাকচিক্যে তোমরা মুগ্ধ হয়েছো, এতো নিছক একটি সাময়িক সৌন্দর্য, নিছক তোমাদের পরীক্ষার জন্য এর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এসব কিছু আমি তোমাদের আয়েশ আরামের জন্য সরবরাহ করেছি, তোমরা এ ভুল ধারণা করে বসেছো। তাই জীবনের মজা লুটে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যের প্রতি তোমরা ভ্রুক্ষেপই করছো না। এ জন্যই তোমরা কোন উপদেশদাতার কথায় কান দিচ্ছো না। কিন্তু আসলে তো এগুলো আয়েশ আরামের জিনিস নয় বরং পরীক্ষার উপকরণ। এগুলোর মাঝখানে তোমাদের বসিয়ে দিয়ে দেখা হচ্ছে, তোমাদের মধ্য থেকে কে তার নিজের আসল স্বরূপ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার এসব মন মাতানো সামগ্রীর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে এবং কে তার আসল মর্যাদার (আল্লাহর বন্দেগী) কথা মনে রেখে সঠিক নীতি অবলম্বন

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿۱۳﴾ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿۱۴﴾ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ۚ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿۱۵﴾

২ রুকূ'

আমি তাদের সত্যিকার ঘটনা তোমাকে শুনাচ্ছি।[৯] তারা কয়েকজন যুবক ছিল, তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।[১০] আমি সে সময় তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম যখন তারা উঠলো এবং ঘোষণা করলো ঃ "আমাদের রব তো কেবল তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে ডাকবো না। যদি আমরা তাই করি তাহলে তা হবে একেবারেই অনর্থক।" (তারপর তারা পরস্পরকে বললো ঃ) "এ আমাদের জাতি, এরা বিশ্বজাহানের রবকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। এরা তাদের মাবুদ হবার সপক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনছে না কেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

করছে। যেদিন এ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে সেদিনই ভোগের এসব সরঞ্জাম খতম করে দেয়া হবে এবং তখন এ পৃথিবী একটি লতাগুল্মহীন ধূ ধূ প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

৬. আরবী ভাষায় বড় ও বিস্তৃত গুহাকে 'কাহ্‌ফ' বলা হয় এবং সংকীর্ণ গহ্বরকে বলা হয় 'গার'।

৭. মূল শব্দ হচ্ছে "আর রকীম।" এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবেঈর বর্ণনা মতে আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনাটি যে জনপদে সংঘটিত হয়েছিল সেই জনপদটির নাম ছিল আর রকীম। এটি "আইলাহ" (অর্থাৎ আকাবাহ) ও ফিলিস্তীনের মাঝামাঝি একটি স্থানে অবস্থিত ছিল। আবার অনেক পুরাতন মুফাস্‌সির বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, এ নাম দিয়ে গুহা মুখে আসহাবে কাহ্‌ফের স্মৃতি রক্ষার্থে যে ফলক বা শিলালিপিটি লাগানো হয়েছিল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর 'তরজমানুল কুরআন' তাফসীর গ্রন্থে প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, এ স্থানটিকেই বাইবেলের যিহোশূয় পুস্তকের ১৮ ঃ ২৬ শ্লোকে রেকম বা রাকম বলা হয়েছে। এরপর তিনি একে ফিলিস্তীনের

বিখ্যাত ঐতিহাসিক কেন্দ্র পেট্টা–এর প্রাচীন নাম হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু তিনি একথা চিন্তা করেননি যে, যিহোশূয় পুস্তকে রেকম বা রাকমের আলোচনা এসেছে বনী বিন ইয়ামীনের (বিন্যামীন সন্তান) মীরাস প্রসংগে। এ সংশ্লিষ্ট পুস্তকের নিজের বর্ণনামতে এ গোত্রের মীরাসের এলাকা জর্দান নদী ও লূত সাগরের (Dead sea) পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। সেখানে পেট্টার অবস্থানের কোন সম্ভাবনাই নেই। পেট্টার ধ্বংসাবশেষ যে এলাকায় পাওয়া গেছে তার ও বনী বিন ইয়ামীনের মীরাসের এলাকার মধ্যে ইয়াহুদা (যিহোদা) ও আদূমীয়ার পুরো এলাকা অবস্থিত ছিল। এ কারণে আধুনিক যুগের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পেট্টা ও রেকম একই জায়গার নাম এ ধারণার কঠোর বিরোধিতা করেছেন। (দেখুন ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৪৬ সালে মুদ্রিত, ১৭ খণ্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা) আমি মনে করি, "আর রকীম" মানে ফলক বা শিলালিপি, এ মতটিই সঠিক।

৮. অর্থাৎ যে আল্লাহ এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার পক্ষে কয়েকজন লোককে দু' তিন শো বছর পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখা এবং তারপর তাদেরকে ঘুমাবার আগে তারা যেমন তরুণ–তাজা ও সুস্থ–সবল ছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় জাগিয়ে তোলা কি তুমি কিছু অসম্ভব বলে মনে করো? যদি চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে তুমি কখনো চিন্তা–ভাবনা করতে তাহলে তুমি একথা মনে করতে না যে, আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ।

৯. এ কাহিনীর প্রাচীনতম বিবরণ পাওয়া গেছে জেম্স সারোজি নামক সিরিয়ার একজন খৃষ্টান পাদ্রীর বক্তৃতামালায়। তার এ বক্তৃতা ও উপদেশবাণী সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত। আসহাবে কাহ্ফের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ৪৫২ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম হয়। ৪৭৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি নিজের এ বক্তৃতামালা সংকলন করেন। এ বক্তৃতামালায় তিনি আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। আমাদের প্রথম যুগের মুফাস্সিরগণ এ সুরিয়ানী বর্ণনার সন্ধান পান। ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্র মাধ্যমে এ কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। অন্যদিকে এগুলো ইউরোপেও পৌঁছে যায়। সেখানে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়। গিবন তার "রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস" গ্রন্থের ৩৩ অধ্যায়ে ঘুমন্ত সাতজন (Seven sleepers) শিরোনামে ঐসব উৎস থেকে এ কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের মুফাস্সিরগণের বর্ণনার সাথে এত বেশী মিলে যায় যে, উভয় বর্ণনা একই উৎস থেকে গৃহীত বলে মনে হয়। যেমন যে বাদশাহর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহাভ্যন্তরে আশ্রয় নেন আমাদের মুফাস্সিরগণ তাঁর নাম লিখেছেন 'দাকয়ানুস' বা 'দাকিয়ানুস' এবং গিবন বলেন, সে ছিল কাইজার 'ডিসিয়াস' (Decius)। এ বাদশাহ ২৪৯ থেকে ২৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালাবার ব্যাপারে তার আমলই সবচেয়ে বেশী দুর্ণাম কুড়িয়েছে। যে নগরীতে এ ঘটনাটি ঘটে আমাদের মুফাস্সিরগণ তার নাম লিখেছেন 'আফ্সুস' বা 'আস্সোস'। অন্যদিকে গিবন তার নাম লিখেছেন 'এফিসুস' (Ephesus)। এ নগরীটি এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে রোমীয়দের সবচেয়ে বড় শহর ও বন্দর নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান তুরস্কের 'ইজমীর' (স্মার্ণা) নগরী থেকে ২০–২৫ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়। (দেখুন ২২২ পৃষ্ঠায়)। তারপর

যে বাদশাহর শাসনামলে আসহাবে কাহ্‌ফ জেগে ওঠেন আমাদের মুফাস্‌সিরগণ তার নাম লিখেছেন 'তেযোসিস' এবং গিবন বলেন, তাদের নিদ্রাভংগের ঘটনাটি কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিস (Theodosius) এর আমলে ঘটে। রোম সাম্রাজ্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়ার পর ৪০৮ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রোমের কাইজার ছিলেন। উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাদের যে সাথীকে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান তার নাম আমাদের মুফাস্‌সিরগণ লিখেছেন 'ইয়াম্‌লিখা' এবং গিবন লিখেছেন 'ইয়াম্‌লিখুস' (Iamblchus) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রেও উভয় বর্ণনা একই রকমের। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, কাইজার ডিসিয়াসের আমলে যখন ঈসা আলাইহিস্‌ সালামের অনুসারীদের ওপর চরম নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তখন এ সাতজন যুবক একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর কাইজার থিযোডোসিসের রাজত্বের ৩৮তম বছরে অর্থাৎ প্রায় ৪৪৫ বা ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে তারা জেগে উঠেছিলেন। এ সময় সমগ্র রোম সাম্রাজ্য ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী। ঐ হিসেবে গুহায় তাদের ঘুমানোর সময় ধরা যায় প্রায় ১৯৬ বছর।

কোন কোন প্রাচ্যবিদ এ কাহিনীটিকে আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী বলে মেনে নিতে এ জন্য অস্বীকার করেছেন যে, সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে কুরআন তাদের গুহায় অবস্থানের সময় ৩০৯ বছর বলে বর্ণনা করছে। কিন্তু ২৫ টীকায় আমি এর জবাব দিয়েছি।

এ সুরিয়ানী বর্ণনা ও কুরআনের বিবৃতির মধ্যে সামান্য বিরোধও রয়েছে। এরি ভিত্তিতে গিবন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে "অজ্ঞতা"র অভিযোগ এনেছেন। অথচ যে বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি এতবড় দুঃসাহস করছেন তার সম্পর্কে তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, সেটি এ ঘটনার তিরিশ চল্লিশ বছর পর সিরিয়ার এক ব্যক্তি লেখেন। আর এত বছর পর নিছক জনশ্রুতির মাধ্যমে একটি ঘটনার বর্ণনা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছুতে পৌঁছুতে কিছু না কিছু বদলে যায়। এ ধরনের একটি ঘটনার বর্ণনাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য মনে করা এবং তার কোন অংশের সাথে বিরোধ হওয়াকে নিশ্চিতভাবে কুরআনের ভ্রান্তি বলে মনে করা কেবলমাত্র এমনসব হঠকারী লোকের পক্ষেই শোভা পায় যারা ধর্মীয় বিদ্বেষ বশে বুদ্ধিমত্তার সামান্যতম দাবীও উপেক্ষা করে যায়।

আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনাটি ঘটে আফসোস (Ephesus) নগরীতে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় এগারো শতকে এ নগরীটির পত্তন হয়। পরবর্তীকালে এটি মূর্তিপূজার বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার লোকেরা চাঁদ বিবির পূজা করতো। তাকে বলা হতো ডায়না (Diana)। এর সুবিশাল মন্দিরটি প্রাচীন যুগের দুনিয়ার অত্যাশ্চর্য বিষয় বলে গণ্য হতো। এশিয়া মাইনরের লোকেরা তার পূজা করতো। রোমান সাম্রাজ্যেও তাকে উপাস্যদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর যখন তাঁর দাওয়াত রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছুতে শুরু করে তখন এ শহরের কয়েকজন যুবকও শিরক থেকে তাওবা করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। খৃষ্টীয় বর্ণনাবলী একত্র করে তাদের ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ গ্রেগরী অব

টুরস (Gregory of Tours) তার গ্রন্থে (Meraculorum Liber) বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

"তারা ছিলেন সাতজন যুবক। তাদের ধর্মান্তরের কথা শুনে কাইজার ডিসিয়াস তাদের নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ধর্ম কি? তারা জানতেন, কাইজার ঈসার অনুসারীদের রক্তের পিপাসু। কিন্তু তারা কোন প্রকার শংকা না করে পরিষ্কার বলে দেন, আমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে আমরা ডাকি না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে অনেক বড় গুনাহ করবো। কাইজার প্রথমে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমাদের মুখ বন্ধ করো, নয়তো আমি এখনই তোমাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করবো। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন, তোমরা এখনো শিশু। তাই তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি তোমরা নিজেদের মত বদলে ফেলো এবং জাতির ধর্মের দিকে ফিরে আসো তাহলে তো ভাল, নয়তো তোমাদের শিরশ্ছেদ করা হবে।"

"এ তিন দিনের অবকাশের সুযোগে এ সাতজন যুবক শহর ত্যাগ করেন। তারা কোন গুহায় লুকাবার জন্য পাহাড়ের পথ ধরেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথে চলতে থাকে। তারা কুকুরটাকে তাদের পিছু নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কিছুতেই তাদের সংগ ত্যাগ করতে রাযী হয়নি। শেষে একটি বড় গভীর বিস্তৃত গুহাকে ভাল আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কুকুরটি গুহার মুখে বসে পড়ে। দারুন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকার কারণে তারা সবাই সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়েন। এটি ২৫০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ১৯৭ বছর পর ৪৪৭ খৃষ্টাব্দে তারা হঠাৎ জেগে ওঠেন। তখন ছিল কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিসের শাসনামল। রোম সাম্রাজ্য তখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আফসোস শহরের লোকেরাও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল।"

"এটা ছিল এমন এক সময় যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরের জীবন এবং কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে জমায়েত ও হিসেব নিকেশ হওয়া সম্পর্কে প্রচণ্ড মতবিরোধ চলছিল। আখেরাত অস্বীকারের ধারণা লোকদের মন থেকে কিভাবে নির্মূল করা যায় এ ব্যাপারটা নিয়ে কাইজার নিজে বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন তিনি এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেন যার মাধ্যমে লোকেরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। ঘটনাক্রমে ঠিক এ সময়েই এ যুবকরা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন।"

"জেগে উঠেই তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি? কেউ বলেন একদিন, কেউ বলেন দিনের কিছু অংশ। তারপর আবার একথা বলে সবাই নীরব হয়ে যান যে এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। এরপর তারা জীন (Jean) নামে নিজেদের একজন সহযোগীকে রূপার কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান। লোকেরা যাতে চিনতে না পারে এ জন্য তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন। তারা ভয় করছিলেন, লোকেরা আমাদের ঠিকানা জানতে পারলে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে এবং ডায়নার পূজা করার জন্য আমাদের বাধ্য করবে। কিন্তু জীন শহরে পৌঁছে সবকিছু বদলে

গেছে দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন সবাই ঈসায়ী হয়ে গেছে এবং ডায়না দেবীর পূজা কেউ করছে না। একটি দোকানে গিয়ে তিনি কিছু রুটি কিনেন এবং দোকানদারকে একটি রূপার মুদ্রা দেন। এ মুদ্রার গায় কাইজার ডিসিয়াসের ছবি ছাপানো ছিল। দোকানদার এ মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, এ মুদ্রা কোথায় পেলে? জীন বলে, এ আমার নিজের টাকা, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসিনি। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। লোকদের ভীড় জমে ওঠে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নগর কোতোয়ালের কাছে পৌঁছে যায়। কোতোয়াল বলেন, এ গুপ্ত ধন যেখান থেকে এনেছো সেই জায়গাটা কোথায় আমাকে বলো। জীন বলেন, কিসের গুপ্তধন? এ আমার নিজের টাকা। কোন গুপ্তধনের কথা আমার জানা নেই। কোতোয়াল বলেন, তোমার একথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তুমি যে মুদ্রা এনেছো এতো কয়েক শো বছরের পুরানো। তুমি তো সবেমাত্র যুবক, আমাদের বুড়োরাও এ মুদ্রা দেখেনি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। জীন যখন শোনেন কাইজার ডিসিয়াস মারা গেছে বহুযুগ আগে তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলতে পারেন না। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, এ তো মাত্র কালই আমি এবং আমার ছয়জন সাথী এ শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং ডিসিয়াসের জুলুম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জীনের একথা শুনে কোতোয়ালও অবাক হয়ে যান। তিনি তাকে নিয়ে যেখানে তার কথা মতো তারা লুকিয়ে আছেন সেই গুহার দিকে চলেন। বিপুল সংখ্যক জনতাও তাদের সাথী হয়ে যায়। তারা যে যথার্থই কাইজার ডিসিয়াসের আমলের লোক সেখানে পৌঁছে এ ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায়। এ ঘটনার খবর কাইজার ডিসিয়াসের কাছেও পাঠানো হয়। তিনি নিজে এসে তাদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের থেকে বরকত গ্রহণ করেন। তারপর হঠাৎ তারা সাতজন গুহার মধ্যে গিয়ে সটান শুয়ে পড়েন এবং তাদের মৃত্যু ঘটে। এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে লোকেরা যথার্থই মৃত্যুর পরে জীবন আছে বলে বিশ্বাস করে। এ ঘটনার পর কাইজারের নির্দেশে গুহায় একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করা হয়।"

খৃস্টীয় বর্ণনাসমূহে গুহাবাসীদের সম্পর্কে এই যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে কুরআন বর্ণিত কাহিনীর সাথে এর সাদৃশ্য এত বেশী যে, এদেরকেই আসহাবে কাহ্ফ বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এ ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন যে, এ ঘটনাটি হচ্ছে এশিয়া মাইনরের আর আরব ভূখণ্ডের বাইরের কোন ঘটনা নিয়ে কুরআন আলোচনা করে না, কাজেই খৃস্টীয় কাহিনীকে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া কুরআনের পথ থেকে বিচ্যুতি হবে। কিন্তু আমার মতে এ আপত্তি ঠিক নয়। কারণ কুরআন মজীদে আসলে আরববাসীদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য এমন সব জাতির ও শক্তির অবস্থা আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাদের সম্পর্কে তারা জানতো। তারা আরবের সীমানার মধ্যে থাকুক বা বাইরে তাতে কিছু আসে যায় না। এ কারণে মিসরের প্রাচীন ইতিহাস কুরআনে আলোচিত হয়েছে। অথচ (প্রাচীন) মিসর আরবের বাইরে অবস্থিত ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, মিসরের ঘটনাবলী যদি কুরআনে আলোচিত হতে পারে তাহলে রোমের ঘটনাবলী কেন হতে পারে না? আরববাসীরা যেভাবে মিসর সম্পর্কে জানতো ঠিক তেমনি রোম সম্পর্কেও তো জানতো। রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা হিজাযের একেবারে উত্তর সীমান্তের সাথে লাগোয়া ছিল। আরবদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত রোমীয় এলাকায় যাওয়া আসা করতো। বহু আরব গোত্র

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴿١٦﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٧﴾

এখন যখন তোমরা এদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে এরা পূজা করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো তখন চলো অমুক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিই।[১১] তোমাদের রব তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের ছায়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের কাজের উপযোগী সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবেন।"

তুমি যদি তাদেরকে গুহায় দেখতে,[১২] তাহলে দেখতে সূর্য উদয়ের সময় তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক থেকে ওঠে এবং অস্ত যাওয়ার সময় তাদেরকে এড়িয়ে বাম দিকে নেমে যায় আর তারা গুহার মধ্যে একটি বিস্তৃত জায়গায় পড়ে আছে।[১৩] এ হচ্ছে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান সে-ই সঠিক পথ পায় এবং যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন তার জন্য তুমি কোন পৃষ্ঠপোষক ও পথপ্রদর্শক পেতে পারো না।

রোমানদের প্রভাবাধীন ছিল। রোম আরবদের জন্য মোটেই অজ্ঞাত দেশ ছিল না। সূরা রূম এর প্রমাণ। এ ছাড়া একথাও চিন্তা করার মতো যে, এ কাহিনীটি আল্লাহ নিজেই স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কুরআন মজীদে বর্ণনা করেননি। বরং মক্কার কাফেরদের জিজ্ঞাসার জবাবে বর্ণনা করেছেন। আর আহলি কিতাবরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য মক্কার কাফেরদেরকে তাঁর কাছ থেকে এমন ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দিয়েছিল যে সম্পর্কে আরববাসীরা মোটেই কিছু জানতো না।

১০. অর্থাৎ যখন তারা সাচ্চা দিলে ঈমান আনলো তখন আল্লাহ তাদের সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের ন্যায় ও সত্যের ওপর অবিচল থাকার সুযোগ দিলেন। তারা নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে কিন্তু বাতিলের কাছে মাথা নত করবে না।

১১. যে সময় এ আল্লাহ বিশ্বাসী যুবকদের জনবসতি ত্যাগ করে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হয় সে সময় এশিয়া মাইনরে এ এফিসুস শহর ছিল মূর্তি পূজা ও যাদু বিদ্যার সবচেয়ে

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ وَكَذَٰلِكَ
بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

৩ রুকূ'

তোমরা তাদেরকে দেখে মনে করতে তারা জেগে আছে, অথচ তারা ঘুমুচ্ছিল। আমি তাদের ডাইনে বাঁয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম।[১৪] *এবং তাদের কুকুর গুহা মুখে সামনের দু'পা ছড়িয়ে বসেছিল। যদি তুমি কখনো উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে তাহলে পিছন ফিরে পালাতে থাকতে এবং তাদের দৃশ্য তোমাকে আতংকিত করতো।*[১৫]

আর এমনি বিস্ময়করভাবে আমি তাদেরকে উঠিয়ে বসালাম[১৬] *যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলোঃ "বলোতো, কতক্ষণ এ অবস্থায় থেকেছো?" অন্যেরা বললো, "হয়তো একদিন বা এর থেকে কিছু কম সময় হবে।" তারপর তারা বললো, "আল্লাহই ভাল জানেন আমাদের কতটা সময় এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। চলো এবার আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রূপার এ মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাই এবং সে দেখুক সবচেয়ে ভাল খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে কিছু খাবার নিয়ে আসুক; আর তাকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, আমাদের এখানে থাকার ব্যাপারটা সে যেন কাউকে জানিয়ে না দেয়।*

বড় কেন্দ্র। সেখানে ছিল ডায়না দেবীর একটি বিরাট মন্দির। এর খ্যাতি তখন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু দূরদেশ থেকে লোকেরা ডায়না দেবীর পূজা করার জন্য সেখানে আসতো। সেখানকার যাদুকর, গণক, জ্যোতিষী ও তাবিজ লেখকরা সারা দুনিয়ায়

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

যদি কোনক্রমে তারা আমাদের নাগাল পায় তাহলে হয় প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা আমাদের জোর করে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আর এমন হলে আমরা কখনো সফলকাম হতে পারবো না।”

—এভাবে আমি নগরবাসীদেরকে তাদের অবস্থা জানালাম,[১৭] যাতে লোকেরা জানতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই আসবে।[১৮] (কিন্তু একটু ভেবে দেখো, যখন এটিই ছিল চিন্তার আসল বিষয়) সে সময় তারা পরস্পর এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল যে, এদের (আসহাবে কাহ্‌ফ) সাথে কি করা যায়। কিছু লোক বললো, “এদের ওপর একটি প্রাচীর নির্মাণ করো, এদের রবই এদের ব্যাপারটি ভাল জানেন।”[১৯] কিন্তু তাদের বিষয়াবলীর ওপর যারা প্রবল ছিল[২০] তারা বললো, “আমরা অবশ্যি এদের ওপর একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করবো।”[২১]

খ্যাতিমান ছিল। সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর পর্যন্ত তাদের জমজমাট কারবার ছিল। এ কারবারে ইহুদীদের বিরাট অংশ ছিল এবং ইহুদীরা তাদের এ কারবারকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আমল থেকে চলে আসা ব্যবসায় মনে করতো। (দেখুন ইনসাইক্লোপিডিয়া বিবলিক্যাল লিটারেচার) শির্‌ক ও কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত এ পরিবেশে আল্লাহ বিশ্বাসীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিলেন পরবর্তী রুকূ’তে আসহাবে কাহ্‌ফের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে ঃ “যদি তাদের হাত আমাদের ওপর পড়ে তাহলে তো তারা আমাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা জোরপূর্বক নিজেদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।”

১২. মাঝখানে একথাটি উহ্য রাখা হয়েছে যে, এ পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী তারা শহর থেকে বের হয়ে পাহাড়গুলোর মধ্যে অবস্থিত একটি গুহায় আত্মগোপন করেন, যাতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু অথবা জোর করে মুরতাদ বানানোর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

১৩. অর্থাৎ তাদের গুহার মুখ ছিল উত্তর দিকে। এ কারণে সূর্যের আলো কোন মওসূমেই গুহার মধ্যে পৌঁছুতো না এবং বাইর থেকে কোন পথ অতিক্রমকারী দেখতে পেতো না গুহার মধ্যে কে আছে।

১৪. অর্থাৎ কেউ বাইর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেও তাদের সাতজনের মাঝে মাঝে পার্শ্বপরিবর্তন করতে থাকার কারণে এ ধারণা করতো যে, এরা এমনিই শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে না।

১৫. অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যে একটি অন্ধকার গুহায় কয়েকজন লোকের এভাবে অবস্থান করা এবং সামনের দিকে কুকুরের বসে থাকা এমন একটি ভয়াবহ দৃশ্য পেশ করে যে, উঁকি দিয়ে যারা দেখতে যেতো তারাই তাদেরকে ডাকাত মনে করে ভয়ে পালিয়ে যেতো। এটি ছিল একটি বড় কারণ, যে জন্য লোকেরা এত দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে জানতে পারেনি। কেউ কখনো ভিতরে ঢুকে আসল ব্যাপারের খোঁজ খবর নেবার সাহসই করেনি।

১৬. যে অদ্ভুত পদ্ধতিতে তাদেরকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল এবং দুনিয়াবাসীকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখা হয়েছিল ঠিক তেমনি সুদীর্ঘকাল পরে তাদের জেগে ওঠাও ছিল আল্লাহর শক্তিমত্তার বিস্ময়কর প্রকাশ।

১৭. গুহাবাসী যুবকদের (আসহাবে কাহ্‌ফ) একজন যখন শহরে খাবার কিনতে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার দুনিয়া বদলে গিয়েছিল। মূর্তি পূজারী রোমানরা দীর্ঘদিন থেকে ঈসায়ী হয়ে গিয়েছিল। ভাষা, তাহযীব, তামাদ্দুন, পোশাক–পরিচ্ছদ সব জিনিসেই সুস্পষ্ট পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। দু'শো বছরের আগের এ লোকটি নিজের সাজ–সজ্জা, পোশাক, ভাষা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারে হঠাৎ এক দর্শনীয় বিষয়ে পরিণত হলেন। তারপর যখন খাবার কেনার জন্য কাইজার ডিসিয়াসের যুগের মুদ্রা পেশ করলেন তখন দোকানদার অবাক হয়ে গেলো। সুরিয়ানী বর্ণনা অনুসারে বলা যায়, দোকানদারের সন্দেহ হলো হয়তো পুরাতন যুগের কোন গুপ্ত ধনের ভাণ্ডার থেকে এ মুদ্রা আনা হয়েছে। কাজেই আশেপাশের লোকদেরকে সেদিকে আকৃষ্ট করলো। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নগর শাসকের হাতে সোপর্দ করা হলো। সেখানে গিয়ে রহস্যভেদ হলো যে, দু'শো বছর আগে হযরত ঈসার (আ) অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য পালিয়েছিলেন এ ব্যক্তি তাদেরই একজন। এ খবর শহরের ঈসায়ী অধিবাসীদের মধ্যে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে শাসকের সাথে বিপুল সংখ্যক জনতাও গুহায় পৌঁছে গেলো। এখন আসহাবে কাহ্‌ফগণ যখন জানতে পারলেন যে, তারা দু'শো বছর ঘুমাবার পর জেগেছেন তখন তারা নিজেদের ঈসায়ী ভাইদেরকে সালাম করে শুয়ে পড়লেন এবং তাদের প্রাণবায়ূ উড়ে গেলো।

১৮. সুরিয়ানী বর্ণনা অনুযায়ী সেকালে সেখানে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে বিষম বিতর্ক চলছিল। যদিও রোমান শাসনের প্রভাবে সাধারণ লোক ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরকাল এ ধর্মের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের অংগ ছিল তবুও তখনো রোমীয় শিরক ও মূর্তি পূজা এবং গ্রীক দর্শনের প্রভাব ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। এর ফলে বহু লোক আখেরাত অস্বীকার অথবা কমপক্ষে তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো। আবার এ সন্দেহ ও অস্বীকারকে যে জিনিসটি শক্তিশালী করছিল সেটি ছিল এই যে, এফিসুসে বিপুল সংখ্যক ইহুদী বাস করতো এবং তাদের একটি সম্প্রদায় (যাদেরকে

সাদুকী বলা হতো। প্রকাশ্যে আখেরাত অস্বীকার করতো। তারা আল্লাহর কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত) থেকে আখেরাত অস্বীকৃতির প্রমাণ পেশ করতো এর মোকাবিলা করার জন্য ঈসায়ী আলেমগণের কাছে শক্তিশালী যুক্তি–প্রমাণ ছিল না। মথি, মার্ক ও লুক লিখিত ইঞ্জিলগুলোতে আমরা সাদুকীদের সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের বিতর্কের উল্লেখ পাই। আখেরাত বিষয়ে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তিনজন ইঞ্জিল লেখকই ঈসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এমন দুর্বল জবাব সংকলন করেছেন যার দুর্বলতা খোদ খৃষ্টান পণ্ডিতগণই স্বীকার করেন (দেখুন মথি ২২ ঃ ৩২–৩৩, মার্ক ১২ ঃ ১৮–২৭, লুক ২০ ঃ ২৭–৪০)। এ কারণে আখেরাত অস্বীকারকারীদের শক্তি বেড়ে যাচ্ছিল এবং আখেরাত বিশ্বাসীরাও সন্দেহ ও দোটানার মধ্যে অবস্থান করতে শুরু করছিল। ঠিক এ সময় আসহাবে কাহ্ফের ঘুম থেকে জেগে ওঠার ঘটনাটি ঘটে এবং এটি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের স্বপক্ষে এমন চাক্ষুষ প্রমাণ পেশ করে যা অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না।

১৯. বক্তব্যের তাৎপর্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি ছিল ঈসায়ী সজ্জনদের উক্তি তাদের মতে আসহাবে কাহ্ফ গুহার মধ্যে যেভাবে শুয়ে আছেন সেভাবেই তাদের শুয়ে থাকতে দাও এবং গুহা মুখ বন্ধ করে দাও। তাদের রবই ভাল জানেন তারা কারা, তাদের মর্যাদা কি এবং কোন্ ধরনের প্রতিদান তাদের উপযোগী।

২০. এখানে রোম সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং খৃষ্টীয় গীর্জার ধর্মীয় নেতৃবর্গের কথা বলা হয়েছে, যাদের মোকাবিলায় সঠিক আকীদা–বিশ্বাসের অধিকারী ঈসায়ীদের কথা মানুষের কাছে ঠাঁই পেতো না। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাধারণ খৃষ্টানদের মধ্যে বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক গীর্জাসমূহে শির্‌ক, আউলিয়া পূজা ও কবর পূজা পুরো জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বুযর্গদের আস্তানা পূজা করা হচ্ছিল এবং ঈসা, মারয়াম ও হাওয়ারীগণের প্রতিমূর্তি গীর্জাগুলোতে স্থাপন করা হচ্ছিল। আসহাবে কাহ্ফের নিদ্রাভংগের মাত্র কয়েক বছর আগে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি কাউন্সিল এ এফিসুসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আল্লাহ হওয়া এবং হযরত মারয়ামের (আ) "আল্লাহ–মাতা" হওয়ার আকীদা চার্চের সরকারী আকীদা হিসেবে গণ্য হয়েছিল এ ইতিহাস সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ বাক্যে যাদেরকে প্রাধান্য লাভকারী বলা হয়েছে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঈসার সাচ্চা অনুসারীদের মোকাবিলায় তৎকালীন খৃষ্টান জনগণের নেতা এবং তাদের শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী যাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল মূলত এরাই ছিল শির্‌কের পতাকাবাহী এবং এরাই আসহাবে কাহ্ফের সমাধি সৌধ নির্মাণ করে সেখানে মসজিদ তথা ইবাদাতখানা নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল

২১. মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক কুরআন মজীদের এ আয়াতটির সম্পূর্ণ উলটা অর্থ গ্রহণ করেছে। তারা এ থেকে প্রমাণ করতে চান যে, সাহাবীগণের কবরের ওপর সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ জায়েয। অথচ কুরআন এখানে তাদের এ গোমরাহীর প্রতি ইংগিত করছে যে, এ জালেমদের মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরকাল অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি

করার জন্য তাদেরকে যে নিদর্শন দেখানো হয়েছিল তাকে তারা শির্‌কের কাজ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে নেয় এবং ভাবে যে, ভালই হলো পূজা করার জন্য আরো কিছু আল্লাহর অলী পাওয়া গেলো। তাছাড়া এই আয়াত থেকে "সালেহীন"—সৎলোকদের কবরের ওপর মসজিদ তৈরী করার প্রমাণ কেমন করে সংগ্রহ করা যেতে পারে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে ঃ

لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُرُج

"কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে যারা বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন।" (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

الا وان من كان قبلكم كانو يتخذون قبور انبياء هم مساجد فانى انهكم عن ذلك (مسلم)

"সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদাতখানা বানিয়ে নিতো। আমি তোমাদের এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম)

لعن الله تعالى اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيآء هم مساجد

"আল্লাহ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদাতখানায় পরিণত করেছে।" (আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

إنَّ أُولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق يوم القيمة –

"এদের অবস্থা এ ছিল যে, যদি এদের মধ্যে কোন সৎলোক থাকতো তাহলে তার মৃত্যুর পর এরা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তার ছবি তৈরী করতো। এরা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে।" (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুস্পষ্ট বিধান থাকার পরও কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তি কুরআন মজীদে ঈসায়ী পাদরী ও রোমীয় শাসকদের যে ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড কাহিনীচ্ছলে বর্ণনা করা হয়েছে তাকেই ঐ নিষিদ্ধ কর্মটি করার জন্য দলীল ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাবার দুঃসাহস কিভাবে করতে পারে?

এ প্রসংগে আরো বলা দরকার যে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড আরুনডেল (Arundell) এশিয়া মাইনরের আবিষ্কার (Discoveries in Asia Minor) নামে নিজের যে প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলাফল পেশ করেন তাতে তিনি বলেন যে, প্রাচীন শহর এফিসুসের ধ্বংসাবশেষ সংলগ্ন পর্বতের ওপর তিনি হযরত মারয়াম ও "সাত ছেলে"র (অর্থাৎ আসহাবে কাহ্‌ফ) সমাধি সৌধের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন।

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থজন ছিল তাদের কুকুরটি। আবার অন্য কিছু লোক বলবে, তারা পাঁচজন ছিল এবং তাদের কুকুরটি ছিল ষষ্ঠ, এরা সব আন্দাজে কথা বলে। অন্যকিছু লোক বলে, তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টমটি তাদের কুকুর।২২ বলো, আমার রবই ভাল জানেন তারা ক'জন ছিল, অল্প লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। কাজেই তুমি সাধারণ কথা ছাড়া তাদের সংখ্যা নিয়ে লোকদের সাথে বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করো না।২৩

২২. এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনার পৌনে তিনশো বছর পরে কুরআন নাযিলের সময় এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত ছিল। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সাধারণ লোকদের জানা ছিল না। আসলে তখন তো ছাপাখানার যুগ ছিল না। কাজেই যেসব বইতে তাদের সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশী সঠিক তথ্যাদি ছিল সেগুলো সাধারণভাবে প্রকাশ করার কোন সুযোগ ছিল না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৌখিক বর্ণনার সাহায্যে ঘটনাবলী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো এবং সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তাদের বহু বিবরণ গল্পের রূপ নিতো। তবুও যেহেতু তৃতীয় বক্তব্যটির প্রতিবাদ আল্লাহ করেননি তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সঠিক সংখ্যা সাতই ছিল।

২৩. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সংখ্যাটি আসল নয় বরং আসল জিনিস হচ্ছে এ কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এ কাহিনী থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, একজন সাচ্চা মুমিনের কোন অবস্থায়ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং মিথ্যার সামনে মাথা নত করে দেবার জন্য তৈরী থাকা উচিত নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুমিনের ভরসা দুনিয়াবী উপায় উপকরণের উপর নয় বরং আল্লাহর উপর থাকতে হবে এবং সত্যপথানুসারী হবার জন্য বাহ্যত পরিবেশের মধ্যে কোন আনুকূল্যের চিহ্ন না দেখা গেলেও আল্লাহর উপর ভরসা করে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যে "প্রচলিত নিয়ম"কে লোকেরা "প্রাকৃতিক আইন" মনে করে এবং এ আইনের বিরুদ্ধে দুনিয়ায় কিছুই হতে পারে না বলে ধারণা করে, আসলে আল্লাহর মোটেই তা মেনে চলার প্রয়োজন নেই। তিনি যখনই এবং যেখানেই চান এ নিয়ম পরিবর্তন করে যে অস্বাভাবিক কাজ করতে চান করতে পারেন। কাউকে দু'শো বছর ঘুম পাড়িয়ে

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝٢٣ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ
هَٰذَا رَشَدًا ۝٢٤ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝٢٥
قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ
وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝٢٦

৪ রুকূ'

—আর দেখো, কোন জিনিসের ব্যাপারে কখনো একথা বলো না, আমি কাল এ কাজটি করবো। (তোমরা কিছুই করতে পারো না) তবে যদি আল্লাহ চান। যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সংগে সংগেই নিজের রবকে স্মরণ করো এবং বলো, "আশা করা যায়, আমার রব এ ব্যাপারে সত্যের নিকটতর কথার দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।"[২৪] —আর তারা তাদের গুহার মধ্যে তিনশো বছর থাকে এবং (কিছু লোক মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে) আরো নয় বছর বেড়ে গেছে।[২৫] তুমি বলো, আল্লাহ তাদের অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে বেশী জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় প্রচ্ছন্ন অবস্থা তিনিই জানেন, কেমন চমৎকার তিনি দ্রষ্টা ও শ্রোতা! পৃথিবী ও আকাশের সকল সৃষ্টির তত্ত্বাবধানকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই এবং নিজের শাসন কর্তৃত্বে তিনি কাউকে শরীক করেন না।

এমনভাবে জাগিয়ে তোলা যে, সে যেন মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েছে এবং তার বয়স, চেহারা–সুরত, পোশাক, স্বাস্থ্য তথা কোনকিছুর ওপর কালের বিবর্তনের কোন প্রভাব না পড়া, এটা তাঁর জন্য কোন বড় কাজ নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানব জাতির অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত বংশধরদেরকে একই সংগে জীবিত করে উঠিয়ে দেয়া, যে ব্যাপারে নবীগণ ও আসমানী কিতাবগুলো আগাম খবর দিয়েছে, আল্লাহর কুদরতের পক্ষে মোটেই কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষেরা কিভাবে প্রতি যুগে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে নিজেদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শিক্ষার সম্পদে পরিণত করার পরিবর্তে উল্‌টা সেগুলোকে নিজেদের বৃহত্তর ভ্রষ্টতার মাধ্যমে পরিণত করতো। আসহাবে কাহ্‌ফের অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ মানুষকে এ জন্য দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ তার মাধ্যমে পরকাল বিশ্বাসের উপকরণ লাভ করবে, ঠিক সেই ঘটনাকেই তারা এভাবে গ্রহণ করলো যে, আল্লাহ তাদেরকে পূজা করার জন্য আরো কিছু সংখ্যক অলী ও পূজনীয় ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন। —এ কাহিনী থেকে মানুষকে এ আসল

শিক্ষাগুলো গ্রহণ করা উচিত এবং এর মধ্যে এগুলোই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত বিষয়। এ বিষয়গুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এ মর্মে অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু করে দেয়া যে, আসহাবে কাহ্ফ কতজন ছিলেন, তাদের নাম কি ছিল, তাদের কুকুরের গায়ের রং কি ছিল—এসব এমন ধরনের লোকের কাজ যারা ভেতরের শাঁস ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের ছাল নিয়ে নাড়াচাড়া করা পছন্দ করে। তাই মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে মুমিনদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি অন্য লোকেরা এ ধরনের অসংলগ্ন বিতর্কের অবতারণা করেও তাহলে তোমরা তাতে নাক গলাবে না এবং এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সময় নষ্ট করবে না। বরং কেবলমাত্র কাজের কথায় নিজেদের সময় ক্ষেপন করবে। এ কারণেই আল্লাহ নিজেও তাদের সঠিক সংখ্যা বর্ণনা করেননি। এর ফলে আজে বাজে বিষয়ের মধ্যে নাক গলিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে যারা অভ্যস্ত তারা নিজেদের এ অভ্যাসকে জিইয়ে রাখার মাল মসলা পাবে না।

২৪. এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। পেছনের আয়াতগুলোর বক্তব্যের সাথে সংযোগ রেখে ধারাবাহিক বক্তব্যের মাঝখানে একথাটি বলা হয়েছে। পেছনের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল ঃ আসহাবে কাহ্ফের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই অনর্থক একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ো না এবং এ ব্যাপারে কারো সাথে বিতর্কও করো না। এ প্রসংগে সামনের দিকের কথা বলার আগে প্রাসংগিক বাক্য হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদেরকে আরো একটি নির্দেশও দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, তুমি কখনো দাবী করে একথা বলো না যে, আমি আগামীকাল অমুক কাজটি করবো। তুমি ঐ কাজটি করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে তুমি কীইবা জানো! তোমার অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং যা ইচ্ছা তা করতে পারবে নিজের কাজের ব্যাপারে এমন স্বাধীন ক্ষমতাও তোমার নেই। তাই কখনো বেখেয়ালে যদি মুখ থেকে এমন কথা বের হয়ে যায় তাহলে সংগে সংগেই সাবধান হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং ইনশাআল্লাহ বলে দাও। তাছাড়া তুমি যে কাজটি করতে বলছো সেটাই অপেক্ষাকৃত কল্যাণকর না অন্য কাজ তার চেয়ে ভাল, একথাও তুমি জানো না। কাজেই আল্লাহর ওপর ভরসা করে এভাবে বলো ঃ আশা করা যায় আমার রব এ ব্যাপারে সঠিক কথা অথবা সঠিক কর্মপদ্ধতির দিকে আমাকে চালিত করবেন।

২৫. আমার মতে এ বাক্যটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ বাক্যের ধারাবাহিকতা এভাবে রক্ষিত হয়েছে যে, "কিছু লোক বলবে তারা তিনজন ছিল এবং চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর............আর কিছু লোক বলে, তারা নিজেদের গুহায় তিনশো বছর ঘুমিয়ে ছিলেন এবং কিছু লোক এ মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে আরো নয় বছর বেড়ে গেছে।" এ বাক্যে তিনশো ও নয় বছরের যে সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে আমার মতে তা আসলে লোকদের উক্তি যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা আল্লাহর উক্তি নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে, পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ নিজেই বলছেন ঃ তুমি বলো, তারা কতদিন ঘুমিয়েছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন। যদি ৩০৯ এর সংখ্যা আল্লাহ নিজেই বলে থাকতেন তাহলে তারপর একথা বলার কোন অর্থ ছিল না। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই হযরত আবদুল্লাহ

وَاتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ أَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

হে নবী![২৬] তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যাকিছু তোমার ওপর অহী করা হয়েছে তা (হুবহু) শুনিয়ে দাও। তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই, (আর যদি তুমি কারো স্বার্থে তার মধ্যে পরিবর্তন করো তাহলে) তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালাবার জন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।[২৭] আর নিজের অন্তরকে তাদের সংগলাভে নিশ্চিন্ত করো যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে সকাল-সাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনো তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরাবে না। তুমি কি পার্থিব সৌন্দর্য পছন্দ করো?[২৮] এমন কোন লোকের আনুগত্য করো না[২৯] যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন।[৩০]

ইবনে আব্বাস (রা)ও এ সদর্থ করেছেন যে, এটি আল্লাহর উক্তি নয় বরং লোকদের উক্তির উদ্ধৃতি মাত্র।

২৬. আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী শেষ হবার পর এবার এখান থেকে দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর আলোচনা শুরু হচ্ছে। এ আলোচনায় মক্কায় মুসলমানরা যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে।

২৭. এর মানে এ নয় যে, নাউযু বিল্লাহ! সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফেরদের স্বার্থে কুরআনে কিছু পরিবর্তন করার এবং কুরাইশ সরদারদের সাথে কিছু কমবেশীর ভিত্তিতে আপোস করে নেবার কথা চিন্তা করছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করছিলেন। বরং মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে এর মধ্যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, যদিও বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেরদেরকে একথা বলা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কালামের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু কমবেশী করার অধিকার রাখেন না। তাঁর কাজ শুধু এতটুকুই, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন

তাকে কোন কিছু কমবেশী না করে হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। তুমি যদি মেনে নিতে চাও তাহলে বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন পেশ করা হয়েছে তাকে পুরোপুরি হুবহু মেনে নাও। আর যদি না মানতে চাও তাহলে সেটা তোমার খুশী তুমি মেনে নিয়ো না। কিন্তু কোন অবস্থায় এ আশা করো না যে, তোমাকে রাজী করার জন্য তোমার খেয়াল-খুশীমতো এ দীনের মধ্যে কোন আংশিক পর্যায়ের হলেও কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হবে। কাফেরদের পক্ষ থেকে বারবার এ মর্মে যে দাবী করা হচ্ছিল যে, আমরা তোমার কথা পুরোপুরি মেনে নেবো এমন জিদ ধরে বসে আছো কেন? আমাদের পৈতৃক দীনের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতি-রেওয়াজের সুবিধা দেবার কথাটাও একটু বিবেচনা করো। তুমি আমাদেরটা কিছু মেনে নাও এবং আমরা তোমারটা কিছু মেনে নিই। এর ভিত্তিতে সমঝোতা হতে পারে এবং এভাবে গোত্রীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য অটুট থাকতে পারে। এটি হচ্ছে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই দাবীর জওয়াব। কুরআনে একাধিক জায়গায় তাদের এ দাবী উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর এ জওয়াবই দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা ইউনুসের ১৫ আয়াতটি দেখুন। বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْبَدِّلْهُ ط- (يونس - ١٥)

"যখন আমার আয়াত তাদেরকে পরিষ্কার শুনিয়ে দেয়া হয় তখন যারা কখনো আমার সামনে হাযির হবার আকাংখা রাখে না তারা বলে, এ ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো অথবা এর মধ্যে কিছু কাটছাঁট করো।"

২৮. ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা অনুযায়ী কুরাইশ সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, বেলাল (রা), সোহাইব (রা), আম্মার (রা), খাব্বাব (রা) ও ইবনে মাসউদের (রা) মতো গরীব লোকেরা তোমার সাথে বসে, আমরা ওদের সাথে বসতে পারি না। ওদেরকে হটাও তাহলে আমরা তোমার মজলিসে আসতে পারি এবং তুমি কি বলতে চাও তা জানতে পারি। একথায় মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমার চারদিকে জমায়েত হয়েছে এবং দিনরাত নিজেদের রবকে স্মরণ করছে তাদেরকে তোমার কাছে থাকতে দাও এবং এ ব্যাপারে নিজের মনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসতে দিও না এবং তাদের দিক থেকে কখনো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। তুমি কি এ আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকদেরকে ত্যাগ করে চাও যে, এদের পরিবর্তে পার্থিব জৌলুসের অধিকারী লোকেরা তোমার কাছে বসুক? এ বাক্যেও বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে কুরাইশ সরদারদেরকে একথা শুনানোই এখানে মূল উদ্দেশ্য যে, তোমাদের এ লোক দেখানো জৌলুস, যার জন্য তোমরা গর্বিত। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে এগুলোর কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। যেসব গরীব লোকের মধ্যে আন্তরিকতা আছে এবং যারা নিজেদের রবের স্মরণ থেকে কখনো গাফিল হয় না তারা তোমার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান। হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সরদারদের মধ্যেও ঠিক এ একই ব্যাপার ঘটেছিল। তারা হযরত নূহকে (আ) বলতো ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَّسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

পরিষ্কার বলে দাও, এ হচ্ছে সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, এখন যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক।[৩১] আমি (অস্বীকারকারী) জালেমদের জন্য একটি আগুন তৈরী করে রেখেছি যার শিখাগুলো তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে।[৩২] সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হবে, যা হবে তেলের তলানির মতো।[৩৩] এবং যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দেবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং কি জঘন্য আবাস।

وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ

"আমরা তো দেখছি আমাদের মধ্যে যারা নিম্ন স্তরের লোক, তারাই না বুঝে সুজে তোমার পেছনে জড়ো হয়েছে।"

হযরত নূহের (আ) জবাব ছিল : مَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "যারা ঈমান এনেছে আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না।" এবং لاَ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا "যাদেরকে তোমরা তাচ্ছিল্যের নজরে দেখো তাদের সম্বন্ধে আমি এ কথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কোন কল্যাণ দান করেননি।" (হূদ ২৭, ২৯, ৩১ আয়াত, আন'আম ৫২ এবং আল হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)।

২৯. অর্থাৎ তার কথা মেনো না, তার সামনে মাথা নত করো না, তার ইচ্ছা পূর্ণ করো না এবং তার কথায় চলো না। এখানে আনুগত্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০. كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا এর একটি অর্থ তাই যা আমি অনুবাদে গ্রহণ করেছি। এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "যে ব্যক্তি সত্যকে পেছনে রেখে এবং নৈতিক সীমারেখা লংঘন করে লাগামহীনভাবে চলে।" উভয় অবস্থায় মূল কথা একই দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিজের নফসের বান্দা হয়ে যায় তার প্রত্যেকটি কাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আল্লাহর সীমারেখা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। এ ধরনের লোকের আনুগত্য করার মানে এ দাঁড়ায় যে, যে আনুগত্য করে সেও আল্লাহর সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অচেতন থেকে যায়, আর যার আনুগত্য করা হয় সে বিভ্রান্ত হয়ে যেখানে যেখানে ঘুরে বেড়ায় আনুগত্যকারীও সেখানে সেখানে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

৩১. এখানে এসে পরিষ্কার বুঝা যায় আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী শুনাবার পর কোন্ উপলক্ষে এ বাক্যটি এখানে বলা হয়েছে। আসহাবে কাহ্‌ফের যে কাহিনী ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছিল, তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার পর তারা কিভাবে

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

তবে যারা মেনে নেবে এবং সৎকাজ করবে, সেসব সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আমি কখনো নষ্ট করি না। তাদের জন্য রয়েছে চির বসন্তের জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী, সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকনে সজ্জিত করা হবে,[৩৪] সূক্ষ্ম ও পুরু রেশম ও কিংখাবের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে এবং উপবেশন করবে উঁচু আসনে বালিশে হেলান দিয়ে,[৩৫] চমৎকার পুরস্কার এবং সর্বোত্তম আবাস!

দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে বলে দেন, "আমাদের রব তো একমাত্র তিনিই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রব।" তারপর কিভাবে তারা নিজেদের পথভ্রষ্ট জাতির সাথে কোনভাবেই আপোস করতে রাযী হননি বরং পূর্ণ–দৃঢ়তার সাথে বলে দেন, "আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকবো না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে তা হবে বড়ই অসংগত ও অন্যায় কথা।" কিভাবে তারা নিজেদের জাতি ও তার উপাস্যদের ত্যাগ করে কোন প্রকার সাহায্য–সহায়তা ও সাজসরঞ্জাম ছাড়াই গুহার মধ্যে লুকিয়ে জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সত্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে গিয়ে নিজের জাতির সাথে আপোস করতে প্রস্তুত হয়নি। তারপর যখন তারা জেগে উঠলেন তখনও তারা যে বিষয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ না করুন, যদি তাদের জাতি কোনভাবে তাদেরকে নিজেদের ধর্মের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় তাহলে তারা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এসব ঘটনা উল্লেখ করার পর এখন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে—আর আসলে ইসলাম বিরোধীদেরকে শুনাবার উদ্দেশ্যেই তাঁকে বলা হচ্ছে—যে, এ মুশরিক ও সত্য অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর সাথে আপোস করার আদৌ কোন প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে তাকে হুবহু তাদের সামনে পেশ করে দাও। যদি তারা মানতে চায় তাহলে মেনে নিক আর যদি না মানতে চায় তাহলে নিজেরাই অশুভ পরিণামের মুখোমুখি হবে। যারা মেনে নিয়েছে তারা কম বয়েসী যুবক অথবা অর্থ ও কপর্দকহীন ফকীর, মিসকীন, দাস বা মজুর যেই হোক না কেন তারাই মহামূল্যবান হীরার টুকরা এবং তাদেরকেই এখানে প্রিয়ভাজন করা হবে। তাদেরকে বাদ দিয়ে এমন সব বড় বড় সরদার ও প্রধানদেরকে কোন কাজেই গ্রাহ্য করা হবে না তারা যত বেশী দুনিয়াবী শান শওকতের অধিকারী হোক না কেন, তারা আল্লাহ থেকে গাফিল এবং নিজেদের প্রবৃত্তির দাস।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا
وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ فَقَالَ
لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ
وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾

৫ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! এদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে দাও।[৩৬] দু' ব্যক্তি ছিল। তাদের একজনকে আমি দু'টি আংগুর বাগান দিয়েছিলাম এবং সেগুলোর চারদিকে খেজুর গাছের বেড়া দিয়েছিলাম আর তার মাঝখানে রেখেছিলাম কৃষি ক্ষেত। দু'টি বাগানই ভাল ফলদান করতো এবং ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা সামান্যও ত্রুটি করতো না। এ বাগান দু'টির মধ্যে আমি একটি নহর প্রবাহিত করেছিলাম এবং সে খুব লাভবান হয়েছিল। এসব কিছু পেয়ে একদিন সে তার প্রতিবেশীর সাথে কথা প্রসংগে বললো, "আমি তোমার চেয়ে বেশী ধনশালী এবং আমার জনশক্তি তোমার চেয়ে বেশী।" তারপর সে তার বাগানে প্রবেশ করলো[৩৭] এবং নিজের প্রতি জালেম হয়ে বলতে লাগলো ঃ "আমি মনে করি না এ সম্পদ কোন দিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩২. 'সুরাদিক' শব্দের আসল মানে হচ্ছে তাঁবুর চারদিকের ক্যাম্বিস কাপড়ের ঘের। কিন্তু জাহান্নামের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার করলে মনে হয় 'সুরাদিক' মানে হবে তার লেলিহান শিখার বিস্তার এবং উত্তাপের প্রভাব বাইরের এলাকায় যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে সেই সমগ্র এলাকার সীমানাই হচ্ছে 'সুরাদিক'। আয়াতে বলা হয়েছে, "তার সুরাদিক তাদেরকে ঘিরে নিয়েছে।" কেউ কেউ এটিকে ভবিষ্যত অর্থে নিয়েছে। অর্থাৎ এর মানে এ বুঝেছে যে, পরলোকে জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। কিন্তু আমি মনে করি এর মানে হবে, সত্য থেকে যে জালেম মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে এখান থেকেই জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখার আওতাভুক্ত হয়ে গেছে এবং তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

৩৩. 'মুহ্ল' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবী অভিধানগুলোয় বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এর মানে লিখেছেন তেলের তলানি। কারোর মতে এ শব্দটি "লাভা" অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, গলিত ধাতু। আবার কারোর মতে এর মানে পুঁজ ও রক্ত।

وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

এবং আমি আশা করি না কিয়ামতের সময় কখনো আসবে। তবুও যদি আমাকে কখনো আমার রবের সামনে ফিরিয়েও নেয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি এর চাইতেও বেশী জাঁকালো জায়গা পাবো।"৩৮ তার প্রতিবেশী কথাবার্তার মধ্যে তাকে বললো, "তুমি কি কুফরী করছো সেই সত্তার যিনি তোমাকে মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে পয়দা করেছেন এবং তোমাকে একটি পূর্ণাবয়ব মানুষ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন?"৩৯ আর আমার ব্যাপারে বলবো, আমার রব তো সেই আল্লাহই এবং আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না। আর যখন তুমি নিজের বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন তুমি কেন বললে না, "আল্লাহ যা চান তাই হয়, তাঁর প্রদত্ত শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই?৪০ যদি তুমি সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে আমাকে তোমার চেয়ে কম পেয়ে থাকো তাহলে অসম্ভব নয় আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে ভাল কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানের ওপর আকাশ থেকে কোন আপদ পাঠাবেন যার ফলে তা বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরে পরিণত হবে।

৩৪. প্রাচীনকালে রাজা বাদশাহরা সোনার কাঁকন পরতেন। জান্নাতবাসীদের পোশাকের মধ্যে এ জিনিসটির কথা বর্ননা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সেখানে তাদেরকে রাজকীয় পোশাক পরানো হবে। একজন কাফের ও ফাসেক বাদশাহ সেখানে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং একজন মুমিন ও সৎ মজদুর সেখানে থাকবে রাজকীয় জৌলুসের মধ্যে।

৩৫. 'আরাইক' শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে "আরীকাহ" আরবী ভাষায় আরীকাহ এমন ধরনের আসনকে বলা হয় যার ওপর ছত্র খাটানো আছে। এর মাধ্যমেও

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে এবং তুমি তাকে কোনক্রমেই উঠাতে পারবে না।" শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত ফসল বিনষ্ট হলো এবং সে নিজের আংগুর বাগান মাচানের ওপর, লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে থাকতে দেখে নিজের নিয়োজিত পুঁজির জন্য আফসোস করতে থাকলো এবং বলতে লাগলো, "হায়! যদি আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম।" —সে সময় আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার মতো কোন গোষ্ঠীও ছিল না, আর সে নিজেও এ বিপদের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না। তখন জানা গেলো, কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে ন্যস্ত, যিনি সত্য। আর পুরস্কার সেটাই ভাল, যা তিনি দান করেন এবং পরিণতি সেটাই শ্রেয়, যা তিনি দেখান।

এখানে এ ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী রাজকীয় সিংহাসনে বসে থাকবে।

৩৬. এ উদাহরণটির প্রাসংগিক সম্পর্ক বুঝার জন্য পেছনের রুকূ'র বিশেষ আয়াতটি সামনে থাকা দরকার যাতে মক্কার অহংকারী সরদারদের কথার জবাব দেয়া হয়েছিল। সরদাররা বলেছিল, আমরা গরীব মুসলমানদের সাথে বসতে পারি না, তাদেরকে সরিয়ে দিলে আমরা তোমার কাছে গিয়ে বসে তুমি কি বলতে চাও তা শুনতে পারি। সূরা আল কালামের ১৭ থেকে ৩৩ আয়াতে যে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে তাও এখানে নজরে রাখা উচিত। তাছাড়া সূরা মার্‌য়ামের ৭৩–৭৪ আয়াত, আল মু'মিনুনের ৫৫ থেকে ৬১ আয়াত, সাবার ৩৪–৩৬ আয়াত এবং হা–মীম সাজদার ৪৯–৫০ আয়াতের ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া দরকার।

৩৭. অর্থাৎ যে বাগানগুলোকে সে নিজের বেহেশত মনে করছিল। অর্বাচীন লোকেরা দুনিয়ায় কিছু ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শান–শওকতের অধিকারী হলেই হামেশা এ বিভ্রান্তির শিকার হয় যে, তারা দুনিয়াতেই বেহেশত পেয়ে গেছে। এখন আর এমন কোন্ বেহেশত আছে যা অর্জন করার জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে?

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

৬ রুকূ'

আর হে নবী! দুনিয়ার জীবনের তাৎপর্য তাদেরকে এ উপমার মাধ্যমে বুঝাও যে, আজ আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদ খুব ঘন হয়ে গেলো আবার কাল এ উদ্ভিদগুলোই শুকনো ভূষিতে পরিণত হলো, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।[৪১] এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য-শোভা মাত্র। আসলে তো স্থায়িত্ব লাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই উত্তম আশা-আকাংখা সফল হবার মাধ্যম।

৩৮. অর্থাৎ যদি পরকাল থেকেই থাকে তাহলে আমি সেখানে এখানকার চেয়েও বেশী সচ্ছল থাকবো। কারণ এখানে আমার সচ্ছল ও ধনাঢ্য হওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, আমি আল্লাহর প্রিয়।

৩৯. যদিও এ ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি বরং وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ এর শব্দাবলী প্রকাশ করছে যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করতো, তবুও তার প্রতিবেশী তাকে আল্লাহর সাথে কুফরী করার দায়ে অভিযুক্ত করলো। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কুফরী করা নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার নাম নয় বরং অহংকার, গর্ব, দম্ভ ও আখেরাত অস্বীকারও কুফরী হিসেবে গণ্য। যে ব্যক্তি মনে করলো, আমিই সব, আমার ধন-সম্পদ ও শান শওকত কারোর দান নয় বরং আমার শক্তি ও যোগ্যতার ফল এবং আমার সম্পদের ক্ষয় নেই, আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবার কেউ নেই এবং কারোর কাছে আমাকে হিসেব দিতেও হবে না, সে আল্লাহকে মানলেও নিছক একটি অস্তিত্ব হিসেবেই মানে, নিজের মালিক প্রভু এবং শাসনকর্তা হিসেবে মানে না। অথচ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মানেই হচ্ছে উপরোক্ত ক্ষমতাগুলো একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত বলে স্বীকার করা, আল্লাহকে নিছক একটি অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার নাম ঈমান নয়।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ
أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ
صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ
رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

সেই দিনের কথা চিন্তা করা দরকার যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে চালিত করবো[৪২] এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে সম্পূর্ণ অনাবৃত[৪৩] আর আমি সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এমনভাবে ঘিরে এনে একত্র করবো যে, (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্য থেকে) একজনও বাকি থাকবে না।[৪৪] এবং সবাইকে তোমার রবের সামনে লাইনবন্দী করে পেশ করা হবে।—নাও দেখে নাও, তোমরা এসে গেছো তো আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে যেমনটি আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।[৪৫] তোমরা তো মনে করেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত ক্ষণ নির্ধারিতই করিনি।—আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট বড় এমন কোন কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করবেন না।

৪০. "অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই হবে। আমাদের ও অন্য কারোর কোন ক্ষমতা নেই। আমাদের যদি কোন জোর চলতে পারে তাহলে তা চলতে পারে একমাত্র আল্লাহরই সুযোগ ও সাহায্য–সহযোগিতা দানের মাধ্যমেই।"

৪১. অর্থাৎ তিনি জীবনও দান করেন আবার মৃত্যুও। তিনি উত্থান ঘটান আবার পতনও ঘটান। তাঁর নির্দেশে বসন্ত আসে এবং পাতা ঝরা শীত মওসুমও তাঁর নির্দেশেই আসে। আজ যদি তুমি সচ্ছল ও আয়েশ আরামের জীবন যাপন করে থাকো তাহলে এ অহংকারে মত্ত হয়ে থেকো না যে, এ অবস্থার পরিবর্তন নেই। যে আল্লাহর হুকুমে তুমি এসব কিছু লাভ করেছো তাঁরই হুকুমে এসব কিছু তোমার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেয়া যেতে পারে।

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿۵۰﴾

৭ রুকূ'

স্মরণ করো যখন আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা করো তখন তারা সিজদা করেছিল কিন্তু ইবলীস করেনি।[৪৭] সে ছিল জিনদের একজন, তাই তার রবের হুকুমের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেলো।[৪৮] এখন কি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাকে এবং তার বংশধরদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিচ্ছো অথচ তারা তোমাদের দুশমন? বড়ই খারাপ বিনিময় জালেমরা গ্রহণ করছে!

৪২. অর্থাৎ যখন যমীনের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে এবং পাহাড় ঠিক এমনভাবে চলতে শুরু করবে যেমন আকাশে মেঘেরা ছুটে চলে। কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ অবস্থাটিকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ

"তুমি পাহাড়গুলো দেখো এবং মনে করো এগুলো অত্যন্ত জমাটবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু এগুলো চলবে ঠিক যেমন মেঘেরা চলে।" (আন্ নামল ঃ ৮৮)।

৪৩. অর্থাৎ এর ওপর কোন শ্যামলতা, বৃক্ষ-তরুলতা এবং ঘরবাড়ি থাকবে না। সারাটা পৃথিবী হয়ে যাবে একটা ধূ ধূ প্রান্তর। এ সূরার সূচনায় এ কথাটিই বলা হয়েছিল এভাবে যে, "এ পৃথিবী পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সেসবই আমি লোকদের পরীক্ষার জন্য একটি সাময়িক সাজসজ্জা হিসেবে তৈরী করেছি। এক সময় আসবে যখন এটি সম্পূর্ণ একটি পানি ও বৃক্ষ লতাহীন মরুপ্রান্তরে পরিণত হবে।"

৪৪. অর্থাৎ আদম থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্বে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যেসব মানুষ জন্ম নেবে, তারা মায়ের পেট থেকে ভুমিষ্ঠ হয়ে দুনিয়ার বুকে একবার মাত্র নিঃশ্বাস নিলেও, তাদের প্রত্যেককে সে সময় পুনরবার পয়দা করা হবে এবং সবাইকে একই সংগে জমা করে দেয়া হবে।

৪৫. অর্থাৎ সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবে ঃ দেখো, নবীগণ যে খবর দিয়েছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে তো। তারা তোমাদের বলতেন, আল্লাহ যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন। তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলে। কিন্তু এখন বলো, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হয়েছে কি না?

৪৬. অর্থাৎ এক ব্যক্তি একটি অপরাধ করেনি কিন্তু সেটি খামাখা তার নামে লিখে দেয়া হয়েছে, এমনটি কখনো হবে না। আবার কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের পাওনা সাজার বেশী সাজা দেয়া হবে না এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অযথা পাকড়াও করেও শাস্তি দেয়া হবে না।

৪৭. এ বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আদম ও ইবলীসের কাহিনীর প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পথভ্রষ্ট লোকদেরকে তাদের এ বোকামির ব্যাপারে সজাগ করে দেয়া যে, তারা নিজেদের স্নেহশীল ও দয়াময় আল্লাহ্ এবং শুভাকাংখী নবীদেরকে ত্যাগ করে এমন এক চিরন্তন শত্রুর ফাঁদে পা দিচ্ছে যে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৪৮. অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল না। বরং সে ছিল জিনদের একজন। তাই তার পক্ষে আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ফেরেশতাদের ব্যাপারে কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলে, তারা প্রকৃতিগতভাবে অনুগত ও হুকুম মেনে চলে ঃ

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

"আল্লাহ তাদেরকে যে হুকুমই দেন না কেন তারা তার নাফরমানী করে না এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।" (আত্ তাহরীম ঃ ৬)

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

"তারা অবাধ্য হয় না, তাদের রবকে, যিনি তাদের ওপর আছেন, ভয় করে এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।" (আন্ নহ্‌ল ঃ ৫০)

অন্যদিকে জিন হচ্ছে মানুষের মতো একটি স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টি। তাদেরকে জন্মগত আনুগত্যশীল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তাদেরকে কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা উভয়টি করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ সত্যটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইবলীস ছিল জিনদের দলভুক্ত, তাই সে স্বেচ্ছায় নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করে ফাসেকীর পথ বাছাই করে নেয়। এ সুস্পষ্ট বক্তব্যটি লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এক ধরনের ভুল ধারণা দূর করে দেয়। এ ধারণাটি হচ্ছে ঃ ইবলীস ফেরেশ্‌তাদের দলভুক্ত ছিল এবং তাও আবার সাধারণ ও মামুলি ফেরেশ্‌তা নয়, ফেরেশ্‌তাদের সরদার। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল হিজর ২৭ এবং আল জিন ১৩–১৫ আয়াত)।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, যদি ইবলীস ফেরেশ্‌তাদের দলভুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে কুরআনের এ বর্ণনা পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে যে, "আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন তারা সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলীস করলো না?" এর জবাব হচ্ছে, ফেরেশ্‌তাদেরকে সিজদা করার হুকুম দেবার অর্থ এ ছিল যে, ফেরেশ্‌তাদের কর্ম ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী পৃষ্ঠে অস্তিত্বশীল সকল সৃষ্টিও মানুষের হুকুমের অনুগত হয়ে যাবে। কাজেই ফেরেশ্‌তাদের সাথে সাথে এ সমস্ত সৃষ্টিও সিজদানত হলো কিন্তু ইবলীস তাদের সাথে সিজদা করতে অস্বীকার করলো। (ইবলীস শব্দের অর্থ জানার জন্য আল মু'মিনুনের ৭৩ টীকা দেখুন)।

مَآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টিতেও তাদেরকে শরীক করিনি।[৪৯] *পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী করা আমার রীতি নয়।*

তাহলে সেদিন এরা কি করবে যেদিন এদের রব এদেরকে বলবে, ডাকো সেই সব সত্তাকে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে?[৫০] *এরা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা এদেরকে সাহায্য করতে আসবে না এবং আমি তাদের মাঝখানে একটিমাত্র ধ্বংস গহবর তাদের সবার জন্য বানিয়ে দেবো।*[৫১] *সমস্ত অপরাধীরা সেদিন আগুন দেখবে এবং বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের এর মধ্যে পড়তে হবে এবং এর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।*

৪৯. এর অর্থ হচ্ছে, এ শয়তানরা তোমাদের আনুগত্য ও বন্দেগী লাভের হকদার হয়ে গেলো কেমন করে? বন্দেগী তো একমাত্র স্রষ্টারই অধিকার হতে পারে। আর এ শয়তানদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এদের আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্মে শরীক হওয়া তো দূরের কথা এরা নিজেরাই তো সৃষ্টি মাত্র।

৫০. এখানে আবার সেই একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ও তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করে অন্য কারো বিধান ও নেতৃত্ব মেনে চলা আসলে তাকে মুখে আল্লাহর শরীক বলে ঘোষণা না দিলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাকে শরীক করারই শামিল। বরং ঐ ভিন্ন সত্তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেও যদি আল্লাহর হুকুমের মোকাবিলায় তাদের হুকুম মেনে চলা হয় তাহলেও মানুষ শির্‌কের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। কাজেই এখানে শয়তানদের ব্যাপারে প্রাকাশ্যে দেখা যাচ্ছে, দুনিয়ায় সবাই তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছে কিন্তু এ অভিশাপের পরও যারা তাদের অনুসরণ করে কুরআন তাদের সবার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনছে যে, তোমরা শয়তানদেরকে আল্লাহর শরীক করে রেখেছো। এটি বিশ্বাসগত শির্‌ক নয় বরং কর্মগত শির্‌ক এবং কুরআন একেও শির্‌ক বলে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ১ খণ্ড, আন্ নিসা, টীকা ৯১–১৪৫; আল আন'আম

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ
أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا
أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৮ রুকূ'

আমি এ কুরআনে লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু মানুষ বড়ই বিবাদপ্রিয়। তাদের সামনে যখন পথনির্দেশ এসেছে তখন কোন্ জিনিসটি তাদেরকে তা মেনে নিতে এবং নিজেদের রবের সামনে ক্ষমা চাইতে বাধা দিয়েছে? এ জিনিসটি ছাড়া আর কিছুই তাদেরকে বাধা দেয়নি যে, তারা প্রতীক্ষা করেছে তাদের সাথে তাই ঘটুক যা পূর্ববর্তী জাতিদের সাথে ঘটে গেছে অথবা তারা আযাবকে সামনে আসতে দেখে নিক।[৫২]

রসূলদেরকে আমি সুসংবাদ দান ও সতর্ক করার দায়িত্ব পালন ছাড়া অন্য কোন কাজে পাঠাই না।[৫৩] *কিন্তু কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মিথ্যার হাতিয়ার দিয়ে সত্যকে হেয় করার চেষ্টা করে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছে।*

৮৭-১০৭; ২ খণ্ড, আত তাওবাহ্, টীকা ৩১; ইবরাহীম, টীকা ৩২; ৩ খণ্ড, মার্য়াম, ৩৭ টীকা; আল মু'মিনুন, ৪১ টীকা; আল ফুরকান ৫৬ টীকা; আল কাসাস, ৮৬ টীকা; ৪ খণ্ড সাবা ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩; ইয়াসীন ৫৩ টীকা; আশ্ শূরা, ৩৮ টীকা; **আল-জাসিয়াহ**, ৩০ টীকা)।

৫১. মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। একটি অর্থ আমি অনুবাদে অবলম্বন করেছি এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবো।" অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল আখেরাতে তা ঘোরতর শত্রুতায় পরিবর্তিত হবে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

আর কে তার চেয়ে বড় জালেম, যাকে তার রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সেই খারাপ পরিণতির কথা ভুলে যায় যার সাজ–সরঞ্জাম সে নিজের জন্য নিজের হাতে তৈরী করেছে? (যারা এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছে) তাদের অন্তরের ওপর আমি আবরণ টেনে দিয়েছি, যা তাদেরকে কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে সৎপথের দিকে যতই আহবান কর না কেন তারা এ অবস্থায় কখনো সৎপথে আসবে না।[৫৪]

তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইলে দ্রুত আযাব পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, তা থেকে পালিয়ে যাবার কোন পথই তারা পাবে না।[৫৫]

এ শাস্তিপ্রাপ্ত জনপদগুলো তোমাদের সামনে আছে,[৫৬] *এরা জুলুম করলে আমি এদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং এদের প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্য আমি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।*

৫২. অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার ব্যাপারে কুরআন কোন ফাঁক রাখেনি। মন ও মস্তিষ্ককে আবেদন করার জন্য যতগুলো প্রভাবশালী পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভবপর ছিল সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তা এখানে অবলম্বিত হয়েছে। এখন সত্যকে মেনে নেবার পথে তাদের জন্য কি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? শুধুমাত্র এটিই যে তারা আযাবের অপেক্ষা করছে। পিটুনি খাওয়া ছাড়া তারা সোজা হতে চায় না।

৫৩. এ আয়াতেরও দু'টি অর্থ হতে পারে এবং এ দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৯ রুকূ'

(এদেরকে সেই ঘটনাটি একটু শুনিয়ে দাও যা মূসার সাথে ঘটেছিল) যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল, "দুই দরিয়ার সংগমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সফর শেষ করবো না, অন্যথায় আমি দীর্ঘকাল ধরে চলতেই থাকবো।"[৫৭] সে অনুসারে যখন তারা তাদের সংগমস্থলে পৌঁছে গেলো তখন নিজেদের মাছের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেলো এবং সেটি বের হয়ে সুড়ংগের মতো পথ তৈরী করে দরিয়ার মধ্যে চলে গেলো। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর মূসা তার খাদমকে বললো, "আমাদের নাশ্‌তা আনো, আজকের সফরে তো আমরা ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" খাদেম বললো, "আপনি কি দেখেছেন, কি ঘটে গেছে? যখন আমরা সেই পাথরটার পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমার মাছের কথা মনে ছিল না এবং শয়তান আমাকে এমন গাফেল করে দিয়েছিল যে, আমি (আপনাকে) তার কথা বলতে ভুলে গেছি। মাছ তো অদ্ভুতভাবে বের হয়ে দরিয়ার মধ্যে চলে গেছে।"

একটি অর্থ হচ্ছে, রসূলদেরকে আমরা এ জন্য পাঠাই যে, ফায়সালার সময় আসার আগে তারা লোকদেরকে আনুগত্যের ভাল ও নাফরমানির খারাপ পরিণতির ব্যাপারে সজাগ করে দেবেন। কিন্তু এ নির্বোধ লোকেরা আগাম সতর্কবাণী থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করছে না এবং রসূল তাদেরকে যে অশুভ পরিণাম থেকে বাঁচাতে চান তারই মুখোমুখি হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যদি আযাব ভোগ করাই তাদের কাছে কাংখিত হয়ে থাকে তাহলে নবীর কাছে তার দাবী না করা উচিত। কারণ নবীকে আযাব দেবার জন্য নয় বরং আযাব দেবার পূর্বে শুধুমাত্র সাবধান করার জন্য পাঠান হয়।

৫৪. অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি বা দল যুক্তি, প্রমাণ ও শুভেচ্ছামূলক উপদেশের মোকাবিলায় বিতর্ক প্রিয়তায় নেমে আসে, মিথ্যা ও প্রতারণার অস্ত্র দিয়ে সত্যের মোকাবিলা করতে থাকে এবং নিজের কৃতকর্মের খারাপ পরিণতি দেখার আগে কারোর বুঝাবার পর নিজের ভুল মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না তখন আল্লাহ তার অন্তরকে তালাবদ্ধ করেন, সত্যের প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্য তার কানকে বধির করে দেন। এ ধরনের লোকেরা উপদেশ বাণীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে না বরং ধ্বংসের গর্তে পড়ে যাবার পরই এদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এরা যে পথে এগিয়ে চলছিল সেটিই ছিল ধ্বংসের পথ।

৫৫. অর্থাৎ কেউ কোন দোষ করলে সংগে সংগেই তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। তাঁর দয়াগুণের দাবী অনুযায়ী অপরাধীদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেন না এবং তাদের সংশোধিত হবার জন্য সুযোগ দিতে থাকেন দীর্ঘকাল। কিন্তু বড়ই মূর্খ তারা যারা এ ঢিল দেয়াকে ভুল অর্থে গ্রহণ করে এবং মনে করে তারা যাই কিছু করুক না কেন তারেদকে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৫৬. এখানে সাবা, সামূদ, মাদায়েন ও লূতের জাতির বিরাণ এলাকাগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কুরাইশরা নিজেদের বাণিজ্যিক সফরের সময় যাওয়া আসার পথে এসব জায়গা দেখতো এবং আরবের অন্যান্য লোকেরাও এগুলো সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিল।

৫৭. এ পর্যায়ে কাফের ও মুমিন উভয় গোষ্ঠীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করাই মূল উদ্দেশ্য। সেই সত্যটি হচ্ছে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে মানুষের স্থূল দৃষ্টি তা থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল গ্রহণ করে। কারণ আল্লাহ যে উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সামনে রেখে কাজ করেন তা তার জানা থাকে না। মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, জালেমরা স্ফীত হচ্ছে, উন্নতি লাভ করছে, নিরপরাধরা কষ্ট ও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে, নাফরমানদের প্রতি অজস্রধারে অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে, আনুগত্যশীলদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে, অসৎলোকেরা আয়েশ আরামে দিন যাপন করছে এবং সৎলোকদের দূরবস্থার শেষ নেই। লোকেরা নিছক এর গুঢ় রহস্য না জানার কারণে সাধারণভাবে তাদের মনে দোদুল্যমানতা এমন কি বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। কাফের ও জালেমরা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে, এ দুনিয়াটা একটা অরাজকতার মুল্লুক। এখানে কোন রাজা নেই। আর থাকলেও তার শাসন শৃংখলা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখানে যার যা ইচ্ছা করতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস বা কৈফিয়ত তলব করার কেউ নেই। এ ধরনের ঘটনাবলী দেখে মুমিন মনমরা হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় কঠিন পরীক্ষাকালে তার ঈমানের ভিতও নড়ে যায়। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নিজের ইচ্ছা জগতের পরদা উঠিয়ে এক ঝলক দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সেখানে দিনরাত কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে এবং ঘটনার বহিরাংগন তার অভ্যন্তর থেকে কেমন ভিন্নতর হয় তা তিনি জানতে পারেন।

হযরত মূসার (আ) এ ঘটনাটা কোথায় ও কবে সংঘটিত হয়? কুরআনে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। হাদীসে অবশ্যি আমরা আওফীর একটি বর্ণনা পাই, যাতে তিনি
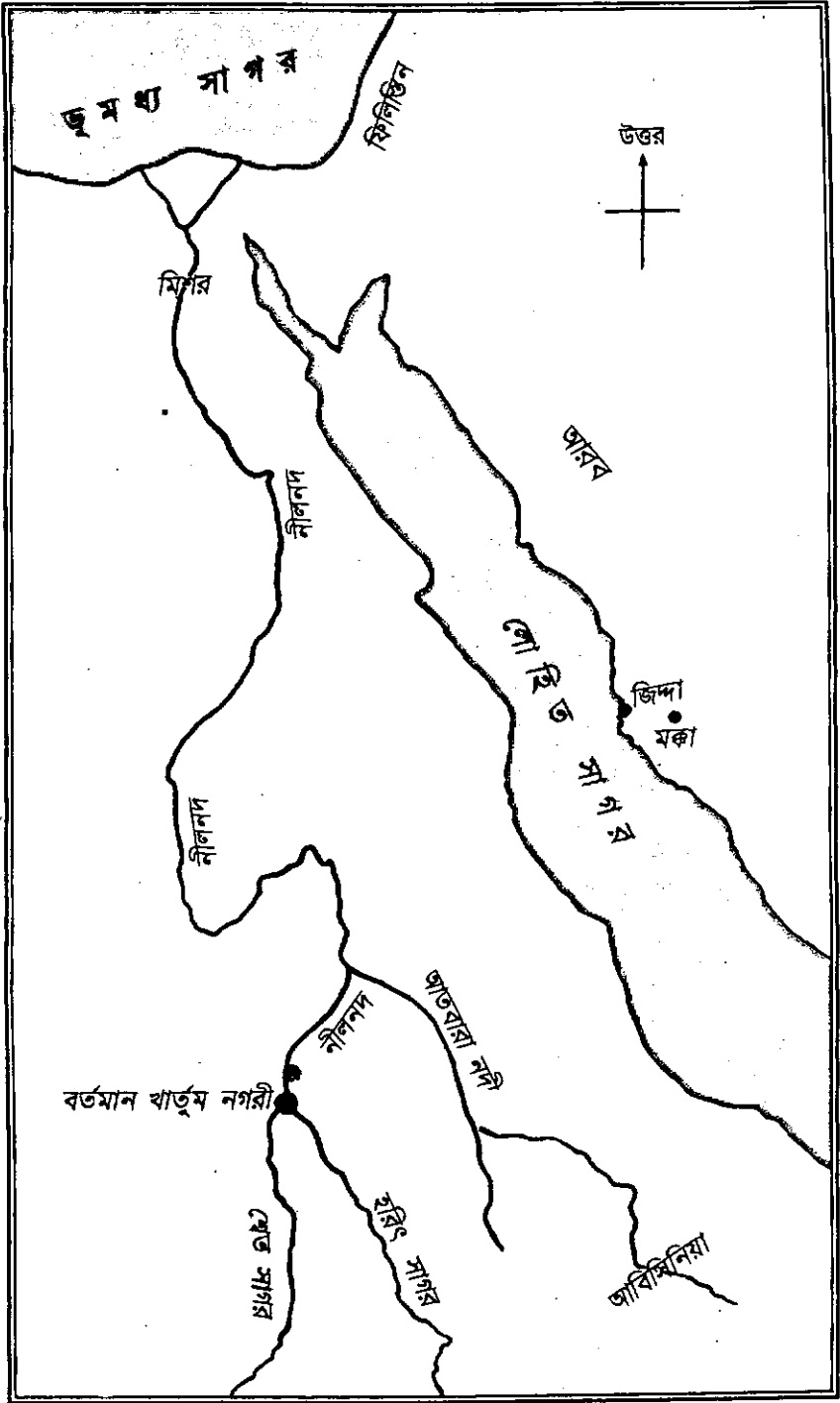
হযরত মূসা (আ) ও খিজিরের (আ) কিসসা সংক্রান্ত মানচিত্র

ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) যখন মিসরে নিজের জাতির বসতি স্থাপন করেন তখন এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে তা এ বর্ণনা সমর্থন করে না। তাছাড়া অন্য কোন উপায়েও একথা প্রমাণ হয় না যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) কখনো মিসরে গিয়েছিলেন। বরং কুরআন একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, মিসর ত্যাগ করার পর তাঁর সমস্তটা সময় সিনাই ও তীহ অঞ্চলে কাটে। কাজেই এ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দু'টি কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি। এক, হযরত মূসাকে (আ) হয়তো তাঁর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে এ পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছিল। কারণ নবুওয়াতের শুরুতেই পয়গম্বরদের জন্য এ ধরনের শিক্ষা ও অনুশীলনের দরকার হয়ে থাকে। দুই, মুসলমানরা মক্কা মু'আয্‌যমায় যে ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল বনী ইসরাঈলও যখন তেমনি ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিল তখনই হযরত মূসার জন্য এ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকবে। এ দু'টি কারণে আমাদের অনুমান, (অবশ্য সঠিক কথা একমাত্র আল্লাহ জানেন) এ ঘটনার সম্পর্ক এমন এক যুগের সাথে যখন মিসরে বনী ইস্‌রাঈলদের ওপর ফেরাউনের জুলুমের সিলসিলা জারি ছিল এবং মক্কার কুরাইশ সরদারদের মতো ফেরাউন ও তার সভাসদরাও আযাবে বিলম্ব দেখে ধারণা করছিল যে, তাদের ওপরে এমন কোন সত্তা নেই যার কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং মক্কার মজলুম মুসলমানদের মতো মিসরের মজলুম মুসলমানরাও অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, হে আল্লাহ! আর কত দিন এ জালেমদেরকে পুরস্কৃত এবং আমাদের ওপর বিপদের সয়লাব–স্রোত প্রবাহিত করা হবে? এমনকি হযরত মূসাও চীৎকার করে উঠেছিলেন ঃ

رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ –

"হে পরওয়ারদিগার! তুমি ফেরাউন ও তার সভাসদদেরকে দুনিয়ার জীবনে বড়ই শান শওকত ও ধন–দওলত দান করেছো। হে আমাদের প্রতিপালক! এটাকি এ জন্য যে, তারা দুনিয়াকে তোমার পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করবে?" (ইউনুস ঃ ৮৮)

যদি আমাদের এ অনুমান সঠিক হয় তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, সম্ভবত হযরত মূসার (আ) এ সফরটি ছিল সুদানের দিকে। এ ক্ষেত্রে দু' দরিয়ার সংগমস্থল বলতে বুঝাবে বর্তমান খার্তুম শহরের নিকটবর্তী নীল নদের দুই শাখা বাহ্‌রুল আব্‌ইয়াদ (হোয়াইট নীল) ও বাহরুল আযরাক্ব (ব্লু নীল) যেখানে এসে মিলিত হয়েছে (দেখুন ২২১ পৃষ্ঠার চিত্র)। হযরত মূসা (আ) সারা'জীবন যেসব এলাকায় কাটিয়েছেন সেসব এলাকায় এ একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও দু'নদীর সংগমস্থল নেই।

এ ঘটনাটির ব্যাপারে বাইবেল একেবারে নীরব। তবে তালমুদে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে এ ঘটনাটিকে মূসার (আ) পরিবর্তে 'রাব্বী ইয়াহহানান বিন লাভীর' সাথে সম্পৃক্ত

করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "হযরত ইলিয়াসের সাথে উল্লেখিত রাব্বীর এ ঘটনাটি ঘটে। হযরত ইলিয়াসকে (আ) দুনিয়া থেকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নেয়ার পর ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি দুনিয়ার ব্যাবস্থাপনায় নিযুক্ত হয়েছেন।" (THE TALMUD SELECTIONS BY H. POLANO. PP. 313—16) সম্ভবত বনী ইস্রাঈলের মিসর ত্যাগের পূর্বেকার ঘটনাবলীর ন্যায় এ ঘটনাটিও সঠিক অবস্থায় সংরক্ষিত থাকেনি এবং শত শত বছর পরে তারা ঘটনার এক জায়গার কথা নিয়ে আর এক জায়গায় জুড়ে দিয়েছে। তালমুদের এ বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের কেউ কেউ একথা বলে দিয়েছেন যে, কুরআনের এ স্থানে যে মূসার কথা বলা হয়েছে তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নন বরং অন্য কোন মূসা হবেন। কিন্তু তালমুদের প্রত্যেকটি বর্ণনাকে নির্ভুল ইতিহাস গণ্য করা যেতে পারে না। আর কুরআনে কোন অজানা ও অপরিচিত মূসার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, এ ধরনের কোন কথা অনুমান করার কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহে যখন হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) এ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে মূসা বলতে বনী ইস্রাঈলের নবী হযরত মূসাকে (আ) নির্দেশ করেছেন। তখন কোন মুসলমানের জন্য তালমুদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না।

পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে কুরআন মজীদের এ কাহিনীটিরও উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হবার চেষ্টা করেছেন। তারা তিনটি কাহিনীর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে বলেছেন যে, এসব জায়গা থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি নকল করেছেন এবং তারপর দাবী করেছেন, আমাকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গিলগামিশের কাহিনী, দ্বিতীয়টি সুরিয়ানী সিকান্দার নামা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ওপরে যে ইহুদী বর্ণনাটির উল্লেখ আমরা করেছি। কিন্তু এ কুটীল স্বভাব লোকেরা জ্ঞান চর্চার নামে যেসব গবেষণা ও অনুসন্ধান চালান সেখানে পূর্বাহ্নেই এ সিদ্ধান্ত করে নেন যে, কুরআনকে কোনক্রমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলে মেনে নেয়া যাবে না। কাজেই এখন যে কোনভাবেই এ বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু পেশ করেছেন তা অমুক অমুক জায়গা থেকে চুরি করা বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি থেকে গৃহীত। এ ন্যক্কারজনক গবেষণা পদ্ধতিতে তারা এমন নির্লজ্জভাবে টানাহেঁচড়া করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায় যে, তা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘৃণায় মন রি রি করে ওঠে এবং মানুষ বলতে বাধ্য হয় ঃ যদি এর নাম হয় তাত্বিক গবেষণা তাহলে এ ধরনের তত্ব-জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি অভিশাপ। কোন জ্ঞানান্বেষণকারী তাদের কাছে যদি কেবলমাত্র চারটি বিষয়ের জবাব চায় তাহলে তাদের বিদ্বেষমূলক মিথ্যাচারের একেবারেই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে ঃ

এক, আপনাদের কাছে এমন কি প্রমাণ আছে, যার ভিত্তিতে আপনারা দু'চারটে প্রাচীন গ্রন্থে কুরআনের কোন বর্ণনার সাথে কিছুটা মিলে যায় এমন ধরনের বিষয় পেয়েই দাবী করে বসেন যে, কুরআনের বর্ণনাটি অবশ্যই এ গ্রন্থগুলো থেকে নেয়া হয়েছে?

দুই, আপনারা বিভিন্ন ভাষার যেসব গ্রন্থকে কুরআন মজীদের কাহিনী ও অন্যান্য বর্ণনার উৎস গণ্য করেছেন সেগুলোর তালিকা তৈরী করলে দস্তুরমতো একটি বড়সড়

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا
مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ
مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ
سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَاِنِ
اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

মূসা বললো, "আমরা তো এরই খোঁজে ছিলাম।"[৫৮] কাজেই তারা দু'জন নিজেদের পদরেখা ধরে পেছনে ফিরে এলো এবং সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেলো, যাকে আমি নিজের অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম।[৫৯]

মূসা তাকে বললো, "আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যাতে আপনাকে যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকেও কিছু শেখাবেন?" সে বললো, "আপনি আমার সাথে সবর করতে পারবেন না। আর তাছাড়া যে ব্যাপারের আপনি কিছুই জানেন না সে ব্যাপারে আপনি সবর করবেনই বা কেমন করে।" মূসা বললো, "ইন্‌শাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী হিসেবেই পাবেন এবং কোন ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুম অমান্য করবো না।" সে বললো, "আচ্ছা, যদি আপনি আমার সাথে চলেন তাহলে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে বলি।"

লাইব্রেরীর গ্রন্থ তালিকা তৈরী হয়ে যাবে। এ ধরনের কোন লাইব্রেরী কি সে সময় মক্কায় ছিল এবং বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকবৃন্দ সেখানে বসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপাদান সরবরাহ করছিলেন? যদি এমনটি না হয়ে থাকে এবং নবুওয়াত লাভের কয়েক বছর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের বাইরে, যে দু'তিনটি সফর করেছিলেন শুধুমাত্র তারই ওপর আপনারা নির্ভর করে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বাণিজ্যিক সফরগুলোয় তিনি কয়টি লাইব্রেরীর বই অনুলিখন বা মুখস্ত করে এনেছিলেন? নবুওয়াতের ঘোষণার একদিন আগেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তায় এ ধরনের তথ্যের কোন চিহ্ন পাওয়া না যাওয়ার যুক্তিসংগত কারণ কি?

তিন, মক্কার কাফের সম্প্রদায়, ইহুদী ও খৃস্টান সবাই অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাগুলো কোথা থেকে আনেন। আপনারা বলতে পারেন নবীর (সা) সমকালীনরা তাঁর এ চুরির কোন খবর পায়নি কেন? এর কারণ কি? তাদেরকে তো বারবারই এ মর্মে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল যে, এ কুরআন আল্লাহ নাযিল করছেন, অহী ছাড়া এর দ্বিতীয় কোন উৎস নেই, যদি তোমরা একে মানুষের বাণী বলো তাহলে মানুষ যে এমন বাণী তৈরী করতে পারে তা প্রমাণ করে দাও। এ চ্যালেঞ্জটি নবীর (সা) সমকালীন ইসলামের শত্রুদের কোমর ভেংগে দিয়েছিল। তারা এমন একটি উৎসের প্রতিও অংগুলি নির্দেশ করতে পারেনি যা থেকে কুরআনের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে বলে কোন বিবেকবান ব্যক্তি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা সন্দেহও করতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সমকালীনরা এ গোয়েন্দাবৃত্তিতে ব্যর্থ হলো কেন? আর হাজার বারোশো বছর পরে আজ বিরোধী পক্ষ এতে সফল হচ্ছেন কেমন করে?

শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে, একথার সম্ভাবনা তো অবশ্যি আছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং এ কিতাবটি বিগত ইতিহাসের এমনসব ঘটনার সঠিক খবর দিচ্ছে যা হাজার হাজার বছর ধরে শ্রুতির মাধ্যমে বিকৃত হয়ে অন্য লোকদের কাছে পৌঁছেছে এবং গল্পের রূপ নিয়েছে। কোন্ ন্যায়সংগত প্রমাণের ভিত্তিতে এ সম্ভাবনাটিকে একদম উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং কেন শুধুমাত্র এ একটি সম্ভাবনাকে আলোচনা ও গবেষণার ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, লোকদের মধ্যে গল্প ও মৌখিক প্রবাদ আকারে যেসব কিস্সা কাহিনী প্রচলিত ছিল কুরআন সেগুলো থেকেই গৃহীত হয়েছে? ধর্মীয় বিদ্বেষ ও হঠকারিতা ছাড়া এ প্রাধান্য দেবার অন্য কোন কারণ বর্ণনা করা যেতে পারে কি?

এ প্রশ্নগুলো নিয়ে যে ব্যক্তিই একটু চিন্তা-ভাবনা করবে তারই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকতে পারে না যে, প্রাচ্যবিদরা "তত্ত্বজ্ঞানের" নামে যা কিছু পেশ করেছেন কোন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী ও জ্ঞানানুশীলনকারীর কাছে তার কানাকড়িও মূল্য নেই।

৫৮. অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যের এ নিশানীটিই তো আমাকে বলা হয়েছিল। এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইংগিতই পাওয়া যায় যে, আল্লাহর ইংগিতেই হযরত মূসা (আ) এ সফর করছিলেন। তাঁর গন্তব্য স্থলের চিহ্ন হিসেবে তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, যেখানে তাঁদের নাশ্তার জন্য নিয়ে আসা মাছটি অদৃশ্য হয়ে যাবে সেখানে তাঁরা আল্লাহর সেই বান্দার দেখা পাবেন, যার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল।

৫৯. সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসে এ বান্দার নাম বলা হয়েছে খিযির। কাজেই ইসরাঈলী বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে যারা হযরত ইলিয়াসের (আ) সাথে এ ঘটনাটি জুড়ে দেন তাদের বক্তব্য মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়। তাদের এ বক্তব্য শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর সাথে সংঘর্ষশীল হবার কারণেই যে ভুল তা নয় বরং এ কারণেও ভুল যে, হযরত ইলিয়াস হযরত মূসার কয়েকশ বছর পরে জন্মলাভ করেছিলেন।

فَانْطَلَقَا حَتّٰى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ
لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتّٰى إِذَا
لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِنْ
سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾

১০ রুকূ'

অতপর তারা দু'জন রওয়ানা হলো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা একটি নৌকায় আরোহণ করলো তখন ঐ ব্যক্তি নৌকা ছিদ্র করে দিল। মূসা বললো, "আপনি কি নৌকার সকল আরোহীকে ডুবিয়ে দেবার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন? এতো আপনি বড়ই মারাত্মক কাজ করলেন।" সে বললো, "আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না?" মূসা বললো, "ভুল চুকের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না, আমার ব্যাপারে আপনি কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন না।"

এরপর তারা দু'জন চললো। চলতে চলতে তারা একটি বালকের দেখা পেলো এবং ঐ ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। মূসা বললো, "আপনি এক নিরপরাধকে হত্যা করলেন, অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি? এটা তো বড়ই খারাপ কাজ করলেন।" সে বললো, "আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না?" মূসা বললো, "এরপর যদি আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। এখন তো আমার পক্ষ থেকে আপনি ওজর পেয়ে গেছেন।"

কুরআনে হযরত মূসার (আ) খাদেমের নামও বলা হয়নি। তবে কোন কোন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইউশা' বিন নূন। পরে তিনি হযরত মূসার (আ) খলীফা হন।

فَانْطَلَقَا حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿৭৭﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا
لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿৭৮﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي
الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ
غَصْبًا ﴿৭৯﴾ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
وَّكُفْرًا ﴿৮০﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿৮১﴾

তারপর তারা সামনের দিকে চললো। চলতে চলতে একটি জনবসতিতে প্রবেশ করলো এবং সেখানে লোকদের কাছে খাবার চাইলো। কিন্তু তারা তাদের দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখলো, সেটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে দেয়ালটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিল। মূসা বললো, "আপনি চাইলে এ কাজের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।" সে বললো, "ব্যাস, তোমার ও আমার সংগ শেষ হয়ে গেলো। এখন আমি যে কথাগুলোর ওপর তুমি সবর করতে পারোনি সেগুলোর তাৎপর্য তোমাকে বলবো। সেই নৌকাটির ব্যাপার ছিল এই যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, তারা সাগরে মেহনত মজদুরী করতো। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ সামনের দিকে ছিল এমন বাদশাহর এলাকা যে প্রত্যেকটি নৌকা জবরদস্তি ছিনিয়ে নিতো। আর ঐ বালকটির ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তার বাপ-মা ছিল মুমিন। আমাদের আশংকা হলো, এ বালক তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ ও কুফরীর মাধ্যমে তাদেরকে বিব্রত করবে। তাই আমরা চাইলাম তাদের রব তার বদলে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়েও তার চেয়ে ভাল হবে এবং যার কাছ থেকে সদয় আচরণও বেশী আশা করা যাবে।

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ؕ

এবার থাকে সেই দেয়ালের ব্যাপারটি। সেটি হচ্ছে এ শহরে অবস্থানকারী দুটি এতীম বালকের। এ দেয়ালের নীচে তাদের জন্য সম্পদ লুকানো আছে এবং তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎলোক। তাই তোমার রব চাইলেন এ কিশোর দু'টি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাক এবং তারা নিজেদের গুপ্ত ধন বের করে নিক। তোমার রবের দয়ার কারণে এটা করা হয়েছে। নিজ ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে আমি এটা করিনি। তুমি যেসব ব্যাপারে সবর করতে পারোনি এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।[৬০]

৬০. এ কাহিনীটির মধ্যে একটি বিরাট জটিলতা আছে। এটি দূর করা প্রয়োজন। হযরত খিযির যে তিনটি কাজ করেছিলেন তার মধ্যে তৃতীয় কাজটির সাথে শরীয়াতের বিরোধ নেই কিন্তু প্রথম কাজ দু'টি নিসন্দেহে মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আল্লাহ যতগুলো শরীয়াত নাযিল করেছেন তাদের প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধী। কারোর মালিকানাধীন কোন জিনিস নষ্ট করার এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি কোন শরীয়াত কোন মানুষকে দেয়নি। এমন কি যদি কোন ব্যক্তি ইলহামের মাধ্যমে জানতে পারে যে, সামনের দিকে এক জালেম একটি নৌকা ছিনিয়ে নেবে এবং অমুক বালকটি বড় হয়ে খোদাদ্রোহী ও কাফের হয়ে যাবে তবুও আল্লাহ প্রেরিত শরীয়াতগুলোর মধ্য থেকে কোন শরীয়াতের দৃষ্টিতেই তার জন্য এ তত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নৌকা ছেঁদা করে দেয়া এবং একটি নিরপরাধ বালককে হত্যা করা জায়েয নয়। এর জবাবে একথা বলা যে, হযরত খিযির এ কাজ দু'টি আল্লাহর হুকুমে করেছিলেন আসলে এতে এই জটিলতা একটুও দূর হয় না। প্রশ্ন এ নয় যে, হযরত খিযির কার হুকুমে এ কাজ করেছিলেন। এগুলো যে আল্লাহর হুকুমে করা হয়েছিল তা তো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কারণ হযরত খিযির নিজেই বলছেন, তাঁর এ কাজগুলো তাঁর নিজের ক্ষমতা ইখতিয়ারভুক্ত নয় বরং এগুলোর উদ্যোক্তা হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও করুণা। আর হযরত খিযিরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তত্বজ্ঞান দেয়া হয়েছিল বলে প্রকাশ করে আল্লাহ নিজেই এর সত্যতার ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহর হুকুমে যে এ কাজ করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে যে আসল প্রশ্ন দেখা দেয় সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর এ বিধান কোন্ ধরনের ছিল? একথা সুস্পষ্ট, এগুলো শরীয়াতের বিধান ছিল না। কারণ কুরআন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ থেকে আল্লাহর শরীয়াতের যেসব মূলনীতি প্রমাণিত হয়েছে তার কোথাও কোন ব্যক্তিকে এ সুযোগ দেয়া হয়নি যে, সে

অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ছাড়াই কাউকে হত্যা করতে পারবে। তাই নিশ্চিতভাবে এ কথা মেনে নিতে হবে যে, এ বিধানগুলো প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর এমন সব সৃষ্টিগত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল যেগুলোর আওতাধীনে দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তে কাউকে রোগগ্রস্ত করা হয়, কাউকে রোগমুক্ত করা হয়, কাউকে মৃত্যু দান করা হয়, কাউকে জীবন দান করা হয়, কাউকে ধ্বংস করা হয় এবং কারোর প্রতি করুণাধারা বর্ষণ করা হয়। এখন যদি এগুলো সৃষ্টিগত বিধান হয়ে থাকে তাহলে এগুলোর দায়িত্ব একমাত্র ফেরেশতাগণের ওপরই সোপর্দ হতে পারে। তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শরীয়াতগত বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা–ইখতিয়ার ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর হুকুম তামিল করে থাকে। আর মানুষের ব্যাপারে বলা যায়, সে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন সৃষ্টিগত হুকুম প্রবর্তনের মাধ্যমে পরিণত হোক বা ইলহামের সাহায্যে এ ধরনের কোন অদৃশ্য জ্ঞান ও হুকুম লাভ করে তা কার্যকর করুক, সর্বাবস্থায় যে কাজটি সে সম্পন্ন করেছে সেটি যদি শরীয়াতের কোন বিধানের পরিপন্থী হয় তাহলে তার গুনাহগার হওয়া থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কারণ মানব সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষ শরীয়াতের বিধান মেনে চলতে বাধ্য। কোন মানুষ ইলহামের মাধ্যমে শরীয়াতের কোন বিধানের বিরুদ্ধাচরণের হুকুম লাভ করেছে এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিরুদ্ধাচরণকে কল্যাণকর বলা হয়েছে বলেই শরীয়াতের বিধানের মধ্য থেকে কোন বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা তার জন্য বৈধ হয়ে গেছে, শরীয়াতের মূলনীতির মধ্যে কোথাও এ ধরনের কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

এটি এমন একটি কথা যার ওপর কেবলমাত্র শরীয়াতের আলেমগণই যে, একমত তাই নয় বরং প্রধান সূফীগণও একযোগে একথা বলেন। আল্লামা আলূসী বিস্তারিতভাবে আবদুল ওয়াহ্‌হাব শি'রানী, মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী, মুজাদ্দিদে আলফিসানি, শায়খ আবদুল কাদের জীলানী, জুনায়েদ বাগদাদী, সাররী সাক্‌তী, আবুল হাসান আন্‌নূরী, আবু সাঈদ আলখাররায্‌, আবুল আব্বাস আহমদ আদ্‌দাইনাওয়ারী ও ইমাম গায্‌যালীর ন্যায় খ্যাতনামা বুযর্গগণের উক্তি উদ্ধৃত করে একথা প্রমাণ করেছেন যে, তাসাউফপন্থীদের মতেও কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী ইল্‌হামকে কার্যকর করা যার প্রতি ইলহাম হয় তার জন্যও বৈধ নয়।

এখন কি আমরা একথা মেনে নেবো যে, এ সাধারণ নিয়ম থেকে মাত্র একজন মানুষকে পৃথক করা হয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন হযরত খিযির? অথবা আমরা মনে করবো, খিযির কোন মানুষ ছিলেন না বরং তিনি আল্লাহর এমনসব বান্দার দলভুক্ত ছিলেন যারা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে (আল্লাহর শরীয়াতের আওতাধীনে নয়) কাজ করেন?

প্রথম অবস্থাটি আমরা মেনে নিতাম যদি কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতো যে, হযরত মূসাকে যে 'বান্দা'র কাছে অনুশীলন লাভের জন্য পাঠানো হয়েছিল তিনি মানুষ ছিলেন। কিন্তু কুরআন তার মানুষ হবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেনি বরং কেবলমাত্র عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (আমার বান্দাদের একজন) বলে ছেড়ে দিয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট, এ বাক্যাংশ থেকে ঐ বান্দার মানব সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া অপরিহার্য হয় না। কুরআন মজীদে বিভিন্ন জায়গায় ফেরেশতাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যেমন দেখুন সূরা আম্বিয়া ২৬ আয়াত এবং সূরা যখরুফ ১৯ আয়াত। তাছাড়া কোন সহী হাদীসেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন বক্তব্য উদ্ধৃত হয়নি যাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হযরত

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ
عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ
فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ
فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً
ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

১১ রুকূ'

আর হে মুহাম্মাদ! এরা তোমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।[৬১] এদেরকে বলে দাও, আমি তার সম্বন্ধে কিছু কথা তোমাদের শুনাচ্ছি।[৬২]

আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছিলাম এবং তাকে সবরকমের সাজ–সরঞ্জাম ও উপকরণ দিয়েছিলাম। সে (প্রথমে পশ্চিমে এক অভিযানের) সাজ–সরঞ্জাম করলো। এমন কি যখন সে সূর্যাস্তের সীমানায় পৌঁছে গেলো[৬৩] তখন সূর্যকে ডুবতে দেখলো একটি কালো জলাশয়ে[৬৪] এবং সেখানে সে একটি জাতির দেখা পেলো। আমি বললাম, "হে যুল্‌কারনাইন! তোমার এ শক্তি আছে, তুমি এদেরকে কষ্ট দিতে পারো অথবা এদের সাথে সদাচার করতে পারো।"[৬৫] সে বললো, "তাদের মধ্য থেকে যে জুলুম করবে আমরা তাকে শাস্তি দেবো তারপর তাকে তার রবের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তিনি তাকে অধিক কঠিন শাস্তি দেবেন। আর তাদের মধ্য থেকে যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তার জন্য আছে ভাল প্রতিদান এবং আমরা তাকে সহজ বিধান দেবো।"

খিযিরকে মানব সম্প্রদায়ের একজন সদস্য গণ্য করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীসটি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি উবাই ইবনে কা'ব থেকে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট পৌঁছেছে। সেখানে হযরত খিযিরের জন্য শুধুমাত্র رجل (রজুল) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যদিও মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত পুরুষদের জন্য

ব্যবহার করা হয় তবুও শুধুমাত্র মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় না। কাজেই কুরআনে এ শব্দটি জিনদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা জিনে বলা হয়েছে ঃ وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ তাছাড়া এ কথা সুস্পষ্ট যে, জিন বা ফেরেশ্‌তা অথবা অন্য কোন অদৃশ্য অস্তিত্ব যখন মানুষের সামনে আসবে তখন মানুষের আকৃতি ধরেই আসবে এবং এ অবস্থায় তাকে মানুষই বলা হবে। হযরত মারয়ামের সামনে যখন ফেরেশ্‌তা এসেছিল তখন কুরআন এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি যে "সেখানে তিনি একজন পুরুষকে পেলেন" হযরত খিযিরের মানুষ হবার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট করছে না। এরপর এ জটিলতা দূর করার জন্য আমাদের কাছে হযরত খিযিরকে মানুষ নয় ফেরেশতা হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথই থাকে না। অথবা তাঁকে আল্লাহর এমন কোন সৃষ্টি মনে করতে হবে যিনি শরীয়াতের বিধানের আওতাধীন নন বরং আল্লাহর ইচ্ছা পুরনের কাজে নিযুক্ত একজন কর্মী। প্রথম যুগের আলেমগণের কেউ কেউও এমত প্রকাশ করেছেন এবং ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মাওয়ারদীর বরাত দিয়ে তা উদ্ধৃত করেছেন।

৬১. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ এ বাক্যটির শুরুতে যে "আর" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার সম্পর্ক অবশ্যই পূর্ববর্তী কাহিনীগুলোর সাথে রয়েছে। এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, মূসা ও খিযিরের কাহিনীও লোকদের প্রশ্নের জবাবে শোনানো হয়েছে। একথা আমাদের এ অনুমানকে সমর্থন করে যে, এ সূরার এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আসলে মক্কার কাফেররা আহলি কিতাবদের পরামর্শক্রমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করেছিল।

৬২. এখানে যে যুলকারনাইনের কথা বলা হচ্ছে তিনি কে ছিলেন, এ বিষয়ে প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজো পর্যন্ত মতবিরোধ চলে আসছে। প্রাচীন যুগের মুফাস্‌সিরগণ সাধারণত যুলকারনাইন বলতে আলেকজাণ্ডারকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু কুরআনে তাঁর যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, আলেকজাণ্ডারের সাথে তার মিল খুবই কম। আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে মুফাসসিরগণের অধিকাংশ এ মত পোষণ করেন যে, তিনি ছিলেন ইরানের শাসনকর্তা খুরস তথা খসরু বা সাইরাস। এ মত তুলনামূলকভাবে বেশী যুক্তিগ্রাহ্য। তবুও এখনো পর্যন্ত সঠিক ও নিশ্চিতভাবে কোন ব্যক্তিকে যুলকারনাইন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারেনি।

কুরআন মজীদ যেভাবে তার কথা আলোচনা করেছে তা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে চারটি কথা জানতে পারি ঃ

এক, তার যুলকারনাইন (শাব্দিক অর্থ "দু' শিংওয়ালা") উপাধিটি কমপক্ষে ইহুদীদের মধ্যে, যাদের ইংগিতে মক্কার কাফেররা তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল, নিশ্চয়ই পরিচিত হওয়ার কথা তাই একথা জানার জন্য আমাদের ইসরাঈলী সাহিত্যের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় থাকে না যে, তারা "দু' শিংওয়ালা" হিসেবে কোন্ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে জানতো?
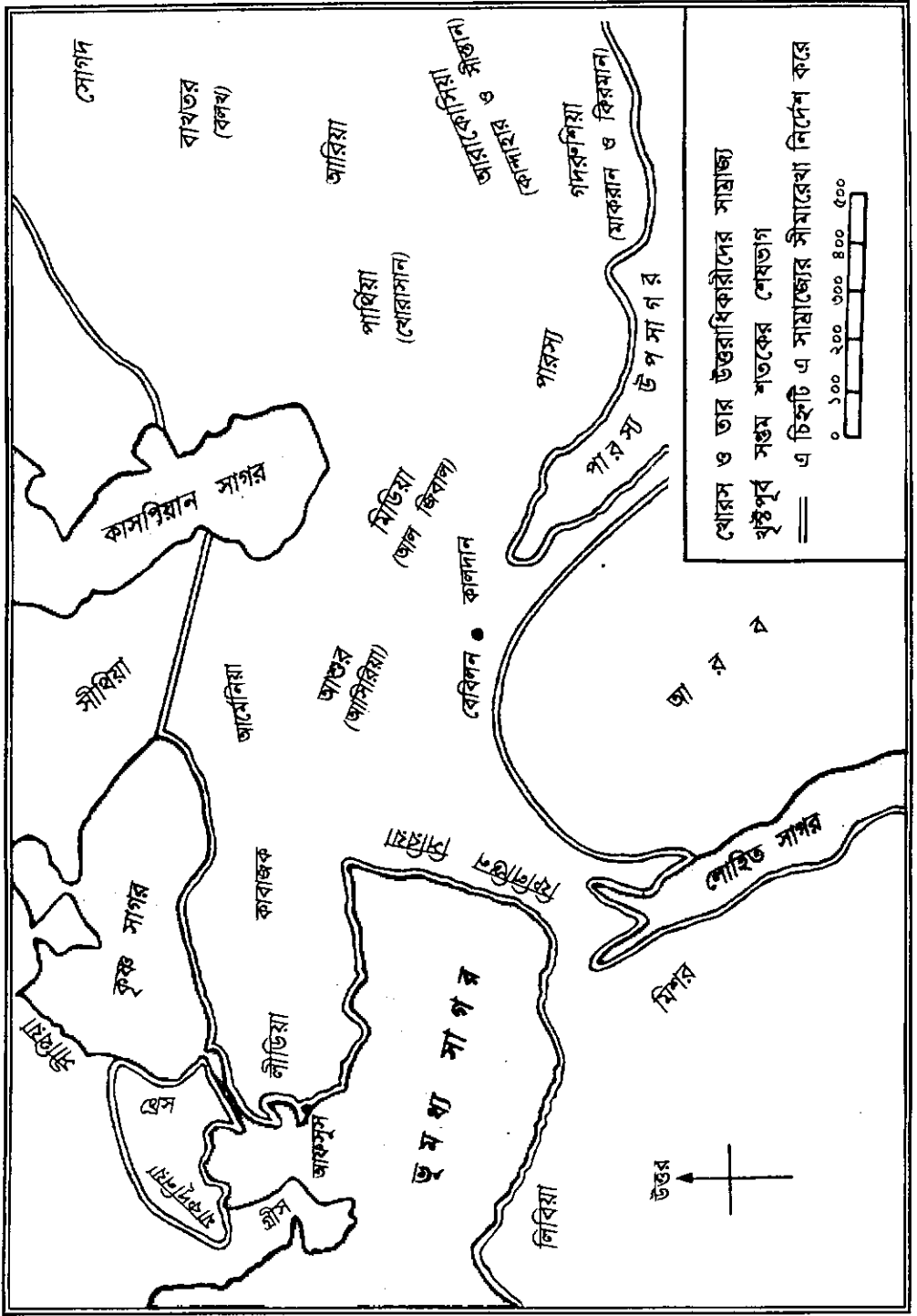
জুলকারনাইন কিস্সা সংক্রান্ত মানচিত্র (সূরা আল-কাহ্ফ ৬২ নং টীকা)

দুই, এ ব্যক্তির অবশ্যই কোন বড় শাসক ও এমন পর্যায়ের বিজেতা হওয়ার কথা যার বিজয় অভিযান পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিচালিত হয়েছিল এবং অন্যদিকে উত্তর–দক্ষিণ দিকেও বিস্তৃত হয়েছিল। কুরআন নাযিলের পূর্বে এ ধরনের কৃতিত্বের অধিকারী মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির কথাই জানা যায়। তাই অনিবার্যভাবে তাদেরই কারোর মধ্যে আমাদের তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ও বৈশিষ্টও খুঁজে দেখতে হবে।

তিন, তাকে অবশ্যই এমন একজন শাসনকর্তা হতে হবে যিনি নিজের রাজ্যকে ইয়াজুজ মা'জুজের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কোন পার্বত্য গিরিপথে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করেন। এ বৈশিষ্টটির অনুসন্ধান করার জন্য আমাদের একথাও জানতে হবে যে, ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে কোন্ জাতিকে বুঝানো হয়েছে এবং তারপর এও দেখতে হবে যে, তাদের এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট এ ধরনের কোন্ প্রাচীর দুনিয়ায় নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেটি কে নির্মাণ করেছে?

চার, তার মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলোসহ এ বৈশিষ্টটিও উপস্থিত থাকা চাই যে, তিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা হবেন। কারণ কুরআন এখানে তার এ বৈশিষ্টটিকেই সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট করেছে।

এর মধ্য থেকে প্রথম বৈশিষ্টটি সহজেই খুরসের (বা সাইরাস) বেলায় প্রযোজ্য। কারণ বাইবেলের দানিয়েল পুস্তকে দানিয়েল নবীর যে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তিনি ইরানীদের উত্থানের পূর্বে মিডিয়া ও পারস্যের যুক্ত সাম্রাজ্যকে একটি দু' শিংওয়ালা মেষের আকারে দেখেন। ইহুদীদের মধ্যে এ "দু' শিংধারী"র বেশ চর্চা ছিল। কারণ তার সাথে সংঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত বেবিলনের সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় এবং বনী ইসরাঈল দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ৮ টীকা)।

দ্বিতীয় চিহ্নটিরও বেশীর ভাগ তার সাথে খাপ খেয়ে যায় কিন্তু পুরোপুরি নয়। তার বিজয় অভিযান নিসন্দেহে পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার সমুদ্রসীমা এবং পূর্বে বখ্‌তর (বলখ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু উত্তরে বা দক্ষিণে তার কোন বড় আকারের অভিযানের সন্ধান এখনো পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়নি। অথচ কুরআন সুস্পষ্টভাবে তার তৃতীয় একটি অভিযানের কথা বর্ণনা করছে। তবুও এ ধরনের একটি অভিযান পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, খুরসের রাজ্য উত্তরে ককেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় চিহ্নটির ব্যাপারে বলা যায়, একথা প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে রাশিয়া ও উত্তর চীনের এমনসব উপজাতিদের বুঝানো হয়েছে যারা তাতারী, মংগল, হূন ও সেথিন নামে পরিচিত এবং প্রাচীন যুগ থেকে সভ্য দেশগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে আসছিল। তাছাড়া একথাও জানা গেছে যে, তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু খুরসই যে, এ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তা এখনো প্রমাণিত হয়নি।

শেষ চিহ্নটি প্রাচীন যুগে একমাত্র খুরসের সাথেই সংযুক্ত করা যেতে পারে। কারণ তাঁর শত্রুরাও তাঁর ন্যায় বিচারের প্রশংসা করেছে। বাইবেলের ইয্রা পুস্তক একথার সাক্ষ বহন করে যে, তিনি নিশ্চয়ই একজন আল্লাহভীরু ও আল্লাহর অনুগত বাদশাহ ছিলেন। তিনি বনী ইসরাঈলকে তাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রীতির কারণেই বেবিলনের দাসত্বমুক্ত করেছিলেন এবং এক ও লা-শরীক আল্লাহর ইবাদাতের জন্য বাইতুল মাকদিসে পুনর্বার হাইকেলে সুলাইমানী নির্মাণ করার হুকুম দিয়েছিলেন।

এ কারণে আমি একথা অবশ্যি স্বীকার করি যে, কুরআন নাযিলের পূর্বে যতজন বিশ্ববিজেতা অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্য থেকে একমাত্র খুরসের মধ্যেই যুলকারনাইনের আলামতগুলো বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু একেবারে নিশ্চয়তা সহকারে তাঁকেই যুলকারনাইন বলে নির্দিষ্ট করার জন্য এখনো আরো অনেক সাক্ষ প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। তবুও কুরআনে উপস্থাপিত আলামতগুলো যত বেশী পরিমাণে খুরসের মধ্যে বিদ্যমান ততটা আর কোন বিজেতার মধ্যে নয়।

ঐতিহাসিক বর্ণনার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, খুরস ছিলেন একজন ইরানী শাসনকর্তা। খৃষ্টপূর্ব ৫৪৯ সনের কাছাকাছি যুগ থেকে তাঁর উত্থান শুরু হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মিডিয়া (আল জিবাল) এবং লিডিয়া (এশিয়া মাইনর) রাজ্য জয় করার পর ৫৩৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে বেবিলন জয় করেন। এরপর তাঁর পথে আর কোন রাজশক্তির বাধা ছিল না। তাঁর বিজয় অভিযান সিন্ধু ও সুগদ (বর্তমান তুর্কিস্তান) থেকে শুরু করে একদিকে মিসর ও লিবিয়া এবং অন্যদিকে থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আবার উত্তর দিকে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে ককেশিয়া ও খাওয়ারিযম পর্যন্ত। বলতে গেলে সেকালের সমগ্র সভ্যজগত তাঁর শাসনাধীন ছিল।

৬৩. ইবনে কাসীরের মতে সূর্যাস্তের সীমানা বলতে বুঝাচ্ছে اقصى ما يسلك فيه من الارض من ناحية المغرب অর্থাৎ তিনি পশ্চিম দিকে দেশের পর দেশ জয় করতে করতে স্থলভাগের শেষ সীমানায় পৌঁছে যান, এরপর ছিল সমুদ্র। এটিই হচ্ছে সূর্যাস্তের সীমানার অর্থ। সূর্য যেখানে অস্ত যায় সেই জায়গার কথা এখানে বলা হয়নি।

৬৪. অর্থাৎ সেখানে সূর্যাস্তের সময় মনে হতো যেন সূর্য সমুদ্রের কালো বর্ণের পংকিল পানির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। যুলকারনাইন বলতে যদি সত্যিই খুরসকেই বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এটি হবে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সমুদ্রতট, যেখানে ঈজিয়ান সাগর ছোট ছোট উপসাগরের রূপ নিয়েছে। কুরআন এখানে 'বাহর' (সমুদ্র) শব্দের পরিবর্তে "আয়েন" শব্দ ব্যবহার করেছে, যা সমুদ্রের পরিবর্তে হ্রদ বা উপসাগর অর্থে অধিক নির্ভুলতার সাথে বলা যেতে পারে। একথাটি আমাদের উপরোক্ত অনুমানকে সঠিক প্রমাণ করে।

৬৫. আল্লাহ যে একথাটি সরাসরি অহী বা ইলহামের মাধ্যমে যুলকারনাইনকে সম্বোধন করে বলে থাকবেন এমন হওয়া জরুরী নয়। তেমনটি হলে তাঁর নবী বা এমন ব্যক্তি হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে যাঁর সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন। এটি এভাবেও হয়ে থাকতে পারে যে, আল্লাহ সমগ্র পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে তার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছেন। এটিই অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। যুলকারনাইন সে সময় বিজয় লাভ করে এ এলাকাটি দখল করে নিয়েছিলেন। বিজিত জাতি তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

তারপর সে (আর একটি অভিযানের) প্রস্তুতি নিল। এমন কি সে সূর্যোদয়ের সীমানায় গিয়ে পৌঁছুলো। সেখানে সে দেখলো, সূর্য এমন এক জাতির ওপর উদিত হচ্ছে যার জন্য রোদ থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা আমি করিনি।[৬৬] এ ছিল তাদের অবস্থা এবং যুলকারনাইনের কাছে যা ছিল তা আমি জানতাম।

আবার সে (আর একটি অভিযানের) আয়োজন করলো। এমনকি যখন দু' পাহাড়ের মধ্যখানে পৌঁছুলো[৬৭] তখন সেখানে এক জাতির সাক্ষাত পেলো। যারা খুব কমই কোন কথা বুঝতে পারতো।[৬৮] তারা বললো, "হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ[৬৯] এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। আমরা কি তোমাকে এ কাজের জন্য কোন কর দেবো, তুমি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবে?

এহেন অবস্থায় আল্লাহ তার বিবেকের সামনে এ প্রশ্ন রেখে দেন যে, এটা তোমার পরীক্ষার সময়, এ জাতিটি তোমার সামনে ক্ষমতাহীন ও অসহায়। তুমি জুলুম করতে চাইলে তার প্রতি জুলুম করতে পারো এবং সদাচার করতে চাইলে তাও তোমার আয়ত্বাধীন রয়েছে।

৬৬. অর্থাৎ তিনি দেশ জয় করতে করতে পূর্ব দিকে এমন এলাকায় পৌঁছে গেলেন যেখানে সভ্য জগতের সীমানা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সামনের দিকে এমন একটি অসভ্য জাতির এলাকা ছিল, যারা ইমারত নির্মাণ তো দূরের কথা তাঁবু তৈরী করতেও পারতো না।

৬৭. যেহেতু সামনের দিকে বলা হচ্ছে যে, এ দু' পাহাড়ের বিপরীত পাশে ইয়াজুজ মাজুজের এলাকা ছিল তাই ধরে নিতে হয় যে, এ পাহাড় বলতে কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী সুবিস্তীর্ণ ককেসীয় পর্বতমালাকে বুঝানো হয়েছে।

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

সে বললো, "আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই যথেষ্ট। তোমরা শুধু শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করে দিচ্ছি।[৭০] আমাকে লোহার পাত এনে দাও।" তারপর যখন দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা সে পূর্ণ করে দিল তখন লোকেদের বললো, এবার আগুন জ্বালাও। এমনকি যখন এই (অগ্নি প্রাচীর) পুরোপুরি আগুনের মতো লাল হয়ে গেলো তখন সে বললো, "আনো, এবার আমি গলিত তামা এর উপর ঢেলে দেবো।" (এ প্রাচীর এমন ছিল যে) ইয়াজুজ ও মাজুজ এটা অতিক্রম করেও আসতে পারতো না এবং এর গায়ে সুড়ংগ কাটাও তাদের জন্য আরো কঠিন ছিল। যুলকারনাইন বললো, "এ আমার রবের অনুগ্রহ। কিন্তু যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতির নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তিনি একে ধূলিস্মাত করে দেবেন[৭১] আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।"[৭২]

৬৮. অর্থাৎ যুলকারনাইন ও তার সাথীদের জন্য তাদের ভাষা ছিল প্রায়ই অপরিচিত ও দুর্বোধ্য। ভীষণভাবে সভ্যতার আলো বিবর্জিত ও বন্য হওয়ার কারণে তাদের ভাষা কেউ জানতো না এবং তারাও কারোর ভাষা জানতো না।

৬৯. ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে বুঝায়, যেমন ওপরে ৬২ টীকায় ইশারা করা হয়েছে যে, এশিয়ার উত্তর পূর্ব এলাকার এমন সব জাতি যারা প্রাচীন যুগে সুসভ্য দেশগুলোর ওপর ধ্বংসাত্মক হামলা চালাতে অভ্যস্ত ছিল এবং মাঝে মধ্যে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধ্বংসের থাবা বিস্তার করতো। বাইবেলের আদি পুস্তকে (১০ অধ্যায়) তাদেরকে হযরত নূহের (আ) পুত্র ইয়াফেসের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও এ একই কথা বলেছেন। হিযকিয়েল (যিহিষ্কেল) পুস্তিকায় (৩৮ ও ৩৯

অধ্যায়) তাদের এলাকা বলা হয়েছে রোশ (রুশ), তূবল (বর্তমান তোবলস্ক) ও মিস্‌ক (বর্তমান মস্কো)কে। ইস্‌রাঈলী ঐতিহাসিক ইউসীফুস তাদেরকে সিথীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম–এর বর্ণনা মতে মাজূজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।

৭০. অর্থাৎ শাসনকর্তা হিসেবে আমার প্রজাদেরকে লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। এ কাজের জন্য তোমাদের ওপর আলাদা করে কোন কর বসানো আমার জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ দেশের যে অর্থভাণ্ডার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন এ কাজ সম্পাদনের জন্য তা যথেষ্ট। তবে শারিরীক শ্রম দিয়ে তোমাদের আমাকে সাহায্য করতে হবে।

৭১. অর্থাৎ যদিও নিজের সামর্থ মোতাবেক আমি অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেছি তবুও এটি কোন অক্ষয় জিনিস নয়। যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন এটি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারপর এর ধ্বংসের জন্য আল্লাহ যে সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন তা যখন এসে যাবে তখন কোন জিনিসই একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। "প্রতিশ্রুতির সময়"–এর দু' অর্থ হয়। এর অর্থ প্রাচীরটি ধ্বংস হবার সময়ও হয় আবার প্রত্যেকটি জিনিসের মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য আল্লাহ যে সময়টি নির্ধারিত করে রেখেছেন সে সময়টিও হয় অর্থাৎ কিয়ামত।

যুলকারনাইন নির্মীত প্রাচীর সম্পর্কে কিছু লোকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। তারা সুপরিচিত চীনের প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর মনে করে। অথচ এ প্রাচীরটি ককেশাসের দাগিস্তান অঞ্চলের দরবন্দ ও দারিয়ালের (Darial) মাঝখানে নির্মীত হয়। ককেশীয় অঞ্চল বলতে বুঝায় কৃষ্ণ সাগর (Black sea) ও কাস্পিয়ান সাগরের (Caspian sea) মধ্যবর্তী এলাকা। এ এলাকায় কৃষ্ণসাগর থেকে দারিয়াল পর্যন্ত রয়েছে সুউচ্চ পাহাড়। এর মাঝখানে যে সংকীর্ণ গিরিপথ রয়েছে কোন দুর্ধর্ষ হানাদার সেনাবাহিনীর পক্ষেও তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তবে দরবন্দ ও দারিয়ালের মধ্যবর্তী এলাকায় পর্বত শ্রেণীও বেশী উঁচু নয় এবং সেখানকার পার্বত্য পথগুলোও যথেষ্ট চওড়া। প্রাচীন যুগে উত্তরের বর্বর জাতিরা এ দিক দিয়েই দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে হত্যা ও লুটতরাজ চালাতো। ইরানী শাসকগণ এ পথেই নিজেদের রাজ্যের ওপর উত্তরের হামলার আশংকা করতেন। এ হামলাগুলো রুখবার জন্য একটি অত্যন্ত মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। এ প্রাচীরটি ছিল ৫০ মাইল লম্বা, ২৯০ ফুট উঁচু এবং ১০ ফুট চওড়া। এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি যে, এ প্রাচীর শুরুতে কে এবং কবে নির্মাণ করেছিল। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ এটিকেই যুলকারনাইনের প্রাচীর বলে অভিহিত করেছেন। কুরআন মজীদে এ প্রাচীর নির্মাণের যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে তার চিহ্নসমূহ এখনো এখানে পাওয়া যায়।

ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে কাসীর তাদের ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনাটি লিখেছেন। ইয়াকুতী তাঁর মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে এরি বরাত দিয়ে লিখেছেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

আর সে দিন[৭৩] আমি লোকদেরকে ছেড়ে দেবো, তারা (সাগর তরংগের মতো) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আমি সব মানুষকে একত্র করবো। আর সেদিন আমি জাহান্নামকে সেই কাফেরদের সামনে আনবো, যারা আমার উপদেশের ব্যাপারে অন্ধ হয়েছিল এবং কিছু শুনতে প্রস্তুতই ছিল না।

আনহু যখন আজারবাইজান বিজয়ের পর ২২ হিজরীতে সুরাকাহ ইবন আমরকে বাবুল আবওয়াব (দরবন্দ) অভিযানে রওয়ানা করেন। সুরাকাহ আবদুর রহমান ইবন রবী'আহকে নিজের অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে সামনের দিকে পাঠিয়ে দেন। আবদুর রহমান যখন আর্মেনীয়া এলাকায় প্রবেশ করেন তখন সেখানকার শাসক শারবরায যুদ্ধ ছাড়াই আনুগত্য স্বীকার করেন। এরপর তিনি বাবুল আবওয়াবের দিকে অগ্রসর হবার সংকল্প করেন। এ সময় শারবরায তাঁকে বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে যুলকারনাইনের প্রাচীর পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। সে আপনাকে এর বিস্তারিত বিবরণ শুনাতে পারে। তদানুসারে তিনি আবদুর রহমানের সামনে সেই ব্যক্তিকে হাযির করেন। (তাবারী, ৩ খণ্ড, ২৩৫–৩৩৯ পৃঃ; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ খণ্ড; ১২২–১২৫ পৃঃ এবং মু'জামুল বুলদান, বাবুল আবওয়াব প্রসংগ)।

এ ঘটনার দুশো' বছর পর আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ (২২৭–২৩৩ হিঃ) যুলকারনাইনের প্রাচীর পরিদর্শন করার জন্য সাল্লামুত তারজুমানের নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি অভিযাত্রী দল পাঠান। ইয়াকুত তাঁর মু'জামুল বুলদান এবং ইবনে কাসীর তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে, এ অভিযাত্রী দলটি সামাররাহ থেকে টিফ্লিস, সেখান থেকে আস্সারীর, ওখান থেকে আল্লান হয়ে দীলান শাহ এলাকায় পৌঁছে যায়। তারপর তারা খাযার (কাস্পিয়ান) দেশে প্রবেশ করেন। এরপর সেখান থেকে দরবন্দে পৌঁছে যুলকারনাইনের প্রাচীর পরিদর্শন করে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২ খণ্ড , ১১১ পৃঃ; ৭ খণ্ড, ১২২–১২৫ পৃ ঃ, মু'জামুল বুলদান, বাবুল আবওয়াব) এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, হিজরী তৃতীয় শতকেও মুসলমানরা ককেশাসের এ প্রাচীরকেই যুলকারনাইনের প্রাচীর মনে করতো।

ইয়াকুত মু'জামুল বুলদানের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টিকেই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। খাযার শিরোনামে তিনি লিখছেন ঃ

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১২ রুকূ'

তাহলে কি[৭৪] যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তারা একথা মনে করে যে, আমাকে বাদ দিয়ে আমার বান্দাদেরকে নিজেদের কর্মসম্পাদনকারী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে?[৭৫] এ ধরনের কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য আমি জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি।

هى بلاد الترك خلف باب الابواب المعروف بالدربند قريب من سد ذى القرنين -

"এটি তুরস্কের এলাকা। যুলকারনাইন প্রাচীরের সন্নিকটে দরবন্দ নামে খ্যাত বাবুল আবওয়াবের পেছনে এটি অবস্থিত।" এ প্রসংগে তিনি খলীফা মুকতাদির বিল্লাহর দূত আহমদ ইব্‌ন ফুদলানের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছেন। তাতে খাযার রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, খাযার একটি রাজ্যের নাম, এর রাজধানী ইতিল। ইতিল নদী এ শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদীটি রাশিয়া ও বুলগার থেকে এসে খাযার তথা কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

বাবুল আবওয়াব শিরোনামে তিনি লিখছেন, তাকে আলবাব এবং দরবন্দও বলা হয়। এটি খাযার (কাস্পিয়ান) সাগর তীরে অবস্থিত। কুফরীর রাজ্য থেকে মুসলিম রাজ্যের দিকে আগমনকারীদের জন্য এ পথটি বড়ই দুর্গম ও বিপদ সংকুল। এক সময় এটি নওশেরেওয়াঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইরানের বাদশাহগণ এ সীমান্ত সংরক্ষণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন।

৭২. যুলকারনাইনের কাহিনী এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কাহিনীটি যদিও মক্কার কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নের জবাবে শুনানো হয় তবুও আসহাবে কাহ্ফ এবং মূসা ও খিযিরের কাহিনীর মতো এ কাহিনিটিকেও কুরআন নিজের রীতি অনুযায়ী নিজের উদ্দেশ্য সাধনে পুরোপুরি ব্যবহার করেছে। এতে বলা হয়েছে, যে যুলকারনাইনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তোমরা আহলি কিতাবদের মুখে শুনেছো সে নিছক একজন বিজেতা ছিল না বরং সে ছিল তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসী মুমিন। সে তার রাজ্যে আদল, ইনসাফ ও দানশীলতার নীতি কার্যকর করেছিল। সে তোমাদের মতো সংকীর্ণচেতা ছিল না। সামান্য সরদারী লাভ করে তোমরা যেমন মনে করো, আমি অদ্বিতীয়, আমার মতো আর কেউ নেই, সে তেমন মনে করতো না।

৭৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের সত্য প্রতিশ্রুতির প্রতি যুলকারনাইন যে ইংগিত করেছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কথাটি বাড়িয়ে এখানে এ বাক্যাংশটি বলা হচ্ছে।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো[৭৬] এবং যারা মনে করতো যে, তারা সব কিছু সঠিক করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রবের নিদর্শনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে হাযির হবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন গুরুত্ব দেবো না।[৭৭]

৭৪. এ হচ্ছে সমস্ত সূরাটার শেষ কথা। তাই যুলকারনাইনের ঘটনার সাথে নয় বরং সূরার সামগ্রিক বিষয়বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক সন্ধান করা উচিত। সূরার সামগ্রিক বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জাতিকে শিরক ত্যাগ করে তাওহীদ বিশ্বাস অবলম্বন করার এবং বৈষয়িক স্বার্থপূজা ত্যাগ করে আখেরাতে বিশ্বাস করার দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু জাতির প্রধান সমাজপতি ও সরদাররা নিজেদের সম্পদ ও পরাক্রমের নেশায় মত্ত হয়ে কেবল তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং যে গুটিকয় সত্যাশ্রয়ী মানুষ এ দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালাচ্ছিল এবং তাদেরকে অপদস্থ ও হেয়প্রতিপন্ন করছিল। এ অবস্থার ওপর এ সমগ্র ভাষণটি দেয়া হয়েছে। ভাষণটি শুরু থেকে এ পর্যন্ত চলে এসেছে এবং এর মধ্যেই বিরোধীরা পরীক্ষা করার জন্য যে তিনটি কাহিনীর কথা জিজ্ঞেস করেছিল সেগুলোও একের পর এক ঠিক জায়গা মতো নিখুঁতভাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন ভাষণ শেষ করতে গিয়ে কথার মোড় আবার প্রথমে যেখান থেকে বক্তব্য শুরু করা হয়েছিল এবং ৪ থেকে ৮ রুকূ' পর্যন্ত যে বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে সেদিকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৭৫. অর্থাৎ এসব কিছু শোনার পরও কি তারা মনে করে যে, এই নীতি তাদের জন্য লাভজনক হবে?

৭৬. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। অনুবাদে আমি একটি অর্থ গ্রহণ করেছি। এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই হারিয়ে গেছে।" অর্থাৎ তারা যা কিছু করেছে আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন হয়ে ও আখেরাতের চিন্তা

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوۡا وَاتَّخَذُوۡۤا اٰيٰتِىۡ وَرُسُلِىۡ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنّٰتُ الۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا لَا يَبۡغُوۡنَ عَنۡهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

যে কুফরী তারা করেছে তার প্রতিফল স্বরূপ এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলদের সাথে যে বিদ্রূপ তারা করতো তার প্রতিফল হিসেবে তাদের প্রতিদান জাহান্নাম। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য থাকবে ফিরদৌসের বাগান।[৭৮] সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং কখনো সে স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না।[৭৯]

না করেই শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই করেছে। দুনিয়ার জীবনকেই তারা আসল জীবন মনে করেছে। দুনিয়ার সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও তাঁর সন্তুষ্টি কিসে এবং তাঁর সামনে গিয়ে আমাদের কখনো নিজেদের কাজের হিসেব দিতে হবে, এ কথা কখনো চিন্তা করেনি। তারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন বুদ্ধিমান জীব মনে করতো, যার কাজ দুনিয়ার এ চারণ ক্ষেত্র থেকে কিছু লাভ হাতিয়ে নেয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

৭৭. অর্থাৎ এ ধরনের লোকেরা দুনিয়ায় যতই বড় বড় কৃতিত্ব দেখাক না কেন, দুনিয়া শেষ হবার সাথে সাথে সেগুলোও শেষ হয়ে যাবে। নিজেদের সুরম্য অট্টালিকা ও প্রাসাদ, নিজেদের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও সুবিশাল লাইব্রেরী, নিজেদের সুবিস্তৃত রাজপথ ও রেলগাড়ী, নিজেদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ, নিজেদের শিল্প ও কলকারখানা, নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও আর্ট গ্যালারী এবং আরো অন্যান্য যেসব জিনিস নিয়ে তারা গর্ভ করে তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসও তারা আল্লাহর তুলাদণ্ডে ওজন করার জন্য নিজেদের সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে পারবে না। সেখানে থাকবে শুধুমাত্র কর্মের উদ্দেশ্য এবং তার ফলাফল। যদি কারোর সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে থাকে, ফলাফলও সে দুনিয়াতেই চেয়ে থাকে এবং দুনিয়ায় নিজের কাজের ফল দেখেও থাকে, তাহলে তার সমস্ত কার্যকলাপ এ ধ্বংসশীল দুনিয়ার সাথেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আখেরাতে যা পেশ করে সে কিছু ওজন পেতে পারে, তা অবশ্যি এমন কোন কর্মকাণ্ড হতে হবে, যা সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছে, তাঁর হুকুম মোতাবেক করেছে এবং যেসব ফলাফল আখেরাতে প্রকাশিত হয় সেগুলোকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে করেছে। এ ধরনের কোন কাজ যদি তার হিসেবের খাতায় না থাকে তাহলে দুনিয়ায় সে যা কিছু করেছিল সবই নিসন্দেহে বৃথা যাবে।

৭৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মুমিনূন, ১০ টীকা।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা[৮০] লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না।

হে মুহাম্মাদ! বলো, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি অহী করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ, কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজের রবের সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।

৭৯. অর্থাৎ তার চেয়ে আরামদায়ক কোন পরিবেশ কোথাও থাকবে না। ফলে জান্নাতের জীবন তার সাথে বিনিময় করার কোন ইচ্ছাই তাদের মনে জাগবে না।

৮০. "কথা" বলে বুঝানো হয়েছে তাঁর কাজ, পূর্ণতার গুণাবলী, বিস্ময়কর ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা লুকমান, ৪৮ টীকা।